১০ই নভেম্বর '৮৩ স্মরণে

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম
জনসংহতি সমিতি

১০ই নভেম্বর '৮৩ স্মরণে

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

প্রচ্ছদ শিল্প—শ্রীঅঙ্কন

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির
তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।

ঃ সূচীপত্র ঃ

১।	রক্তাক্ত ১০ই নভেম্বর—	শ্রীপেলে/ ১
২।	জাতীয় উন্মেষ ও আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলনে জনসংহতি সমিতির ভূমিকা—	শ্রীউত্তরণ/ ৯
৩।	মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সংক্ষিপ্ত জীবনী —	শ্রীহিমাদ্রি/১৬
৪।	প্রদীপ জ্বালাও—	শ্রীতরঙ্গ/২১
৫।	আমাদের কথা—	পার্বত্যবাসী/২১
৬।	কিছু স্মৃতি কিছু কথা—	শ্রীরবি/২২
৭।	আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলন ও পাহাড়ী ছাত্র সমিতি—	শ্রীজিমি/২৩
৮।	স্মৃতির মণি কোঠার একটি দিন—	শ্রীমতি নন্দিতা/২৭
৯।	পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যা ও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা—	শ্রীঅনুপ/২৯
১০।	র-বাঙ্গা ফকিরের কেরামতি—	শ্রীসুজিত/৩৪
১১।	১০ই নভেম্বর একটি কলঙ্ক —	শ্রীসানি/৩৭
১২।	বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়—	শ্রীসঞ্জীব ধামেই/৩৮
১৩।	গৃহযুদ্ধ আন্দোলন প্রতিরোধের ষড়যন্ত্র—	শ্রীঅশোক/৩৯
১৪।	চেতনার মৃত্যু নেই—	শ্রীমতি দিবা/৪৪
১৫।	আসুন, আমরা প্রয়াত নেতার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করি—	শ্রীনিটো/৪৭
১৬।	স্মৃতির পাতা থেকে—	শ্রীদেবাশীষ/৪৮
১৭।	মার্জনা ভিক্ষা—	শ্রীসঞ্জয়/৫০
১৮।	স্মৃতি তর্পন—	শ্রীবকুল/৫১
১৯।	পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা ও তার সমাধানের উপায়—	শ্রীরবি/৫৩
২০।	জনসংহতি সমিতির বিবৃতি—	কেন্দ্রীয় কমিটি/৬২

"শত বছরের ঔপনিবেশিক জীবনের চেয়ে আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার তথা জাতীয়
মুক্তির জন্য মৃত্যু অধিকতর শ্রেয় ও মহৎ।"

—জনসংহতি সমিতি।

"একজন বাঙালী যেমন কোনদিনই একজন চাকমা হতে পারে না,
অনুরূপ একজন চাকমাও কোনদিনই একজন বাঙালী হতে পারে না।"

—এম. এন. লারমা।

দু'টি কথা

আজ ১০ই নভেম্বর, ১৯৮৪ সাল। জন সংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও জুম্ম জাতির জাগরণের অগ্রদূত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী।

আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলন ও জাতীয় জীবনের ইতিহাসে সবচেয়ে মর্মান্তিক ও শোকাবহ দিন আজ এই ১০ই নভেম্বর। জন সংহতি সমিতি আজ এই দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করছে। এই উপলক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে "১০ই নভেম্বর স্মরণে" প্রকাশিত হলো।

এক বৎসর পূর্বে ঠিক এই দিনে জাতীয় বিশ্বাসঘাতক গিরি প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র উচ্চ পর্যায়ের গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত পদদলিত করে ষড়যন্ত্রমূলক এক আকস্মিক হামলা চালিয়ে জুম্ম জাতির জাতীয় চেতনার অগ্রদূত, মহান দেশপ্রেমিক, চিন্তাবিদ ও ক্ষমাশীল, মুক্তিকামী জনতার একনিষ্ঠ বিপ্লবী বন্ধুও জন সংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সহ সমিতির অন্য আটজন বিশ্বস্ত, একনিষ্ঠ, কঠোর সংগ্রামী ও দেশপ্রেমিক যোদ্ধা—পরিমল বিকাশ চাকমা, শুভেন্দু প্রবাস চাকমা, অপর্ণাচরণ চাকমা, অমর কান্তি চাকমা, মনিময় দেওয়ান, সৌমিত্র চাকমা ও অর্জুন ত্রিপুরাকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলন তথা জাতীয় জীবনের ইতিহাসে এই দিনটি খুবই তাৎপর্য বহন করে। চার কুচক্রী ক্ষমতার উচ্চাভিলাষী হয়ে নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গুপ্তচর ও রাজনৈতিক দালালদের খপ্পড়ে পড়ে আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে জাতীয় জীবনে যে দুর্যোগ ও বিপর্যয় ডেকে এনেছে জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জাতি তা কখনও বিস্মৃত হতে পারে না।

প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর দাসানুদাসে পরিণত হয়ে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পার্টির সর্বময় ক্ষমতা দখলের অভিপ্রায়ে এবং নিজেদের দুর্নীতি, ব্যাভিচার ও অপরাধ ঢাকবার অজুহাতে উপদলীয় চক্রান্তকারীরা যে গৃহযুদ্ধের অবতারনা করেছে তাতে জাতীয় জীবনে যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা অতুলনীয় ও অপূরনীয়। বিগত দুটি বছরে অনেক রক্ত ঝরেছে—জন্মভূমির বক্ষ অনাকাঙ্খিত রক্তপাতে বার বার হয়েছে রঞ্জিত। আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলন হয়েছে বিপর্যস্ত। গৃহযুদ্ধের নগ্নতা ও তাণ্ডবতা শুধু মাত্র বিবাদমান দুই পক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারেনি, ব্যাপক জুম্ম জনগণের মধ্যেও তা পরিব্যাপ্ত হয়েছে। বিচ্ছেদপন্থীদের নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতায় ন্যায় ও সত্য পথে ধাবিত আপামর জনগণ হয়েছে জর্জরিত ও দুর্দশাগ্রস্ত; পার্টি তথা জুম্ম জাতি হারিয়েছে তাদের প্রিয় নেতাকে আর গৃহযুদ্ধের তাণ্ডবতা ও বীভৎসতা চিরদিনের মত অবসান করতে গিয়ে অনেক দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবী যোদ্ধাকে নিজেদের অমূল্য জীবন উৎসর্গীকৃত করতে হয়েছে। পক্ষান্তরে উগ্র বাঙ্গালী মুসলমান জাতীয়তাবাদী ও সম্প্রসারণবাদী বাংলাদেশ সরকার ও তার দোসর প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদী গোষ্ঠী অনেক ফায়দা লুটেছে।

আজকের এই শোকময় ও মর্মান্তিক দিনে পার্টি পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে প্রয়াত নেতা এবং সেই সব বিপ্লবী দেশ প্রেমিকদের অবদান যাঁরা জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অখণ্ডত্ব সংরক্ষণের সংগ্রামে শহীদ হয়েছেন, যারা চার কুচক্রীর ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়েছেন এবং যারা গৃহযুদ্ধ চিরতরে অবসান করতে গিয়ে আত্মোৎসর্গীকৃত হয়েছেন। এছাড়া সকল শহীদের শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজন সহ আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার সংগ্রামে যারা পঙ্গু হয়ে দুর্বিসহ জীবন এবং যারা শত্রুর কারাগারে ও বন্দীশালায় দুঃসহ বন্দী জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছেন, তাদের সকলের প্রতি পার্টি জানাচ্ছে গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি।

১০ই নভেম্বর জাতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কিত ও ঘৃনিত কালো দিবস। ১০ই নভেম্বর একটি ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা, ১০ই নভেম্বর একরাশ হতাশা নিরাশা ও ব্যর্থতা। ১০ই নভেম্বর শিক্ষা দিয়েছে শত্রু কারা মিত্র কারা, ১০ই নভেম্বর জন্ম দিয়েছে নূতন প্রতিজ্ঞা ও সংহতি।

গৃহযুদ্ধের অবসান এখনও হতে পারেনি। ব্যাপক জুম্ম জনগণ ও পার্টির প্রতিটি সদস্য গৃহযুদ্ধের বিভীষিকা নিষ্ঠুরতা ও তাণ্ডবতা প্রত্যক্ষ করেছে গৃহযুদ্ধের পরিনতি হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছে। আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকারকামী জুম্ম জনগণ গৃহযুদ্ধের আশু অবসান কামনা করে। কুচক্রীদের হীন চরিত্র আজ ব্যাপক জুম্ম জনগণের নিকট উন্মোচিত। কিন্তু জাতীয় বেঈমান কুচক্রীরা এই হীন ও অন্যায় যুদ্ধকে প্রলম্বিত করে আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলন বানচাল করে দিতে বদ্ধপরিকর হলেও পার্টি তথা জাগ্রত জুম্ম জনতা তা হতে দেবেনা—দিতে পারে না। প্রয়াত নেতার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে সমগ্র পার্টি আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও সংহত।

রক্তাক্ত ১০ই নভেম্বর

—শ্রী পেলে

সেই এক হৃদয় বিদারক, বিভীষিকাময় ঘটনা, উদ্বেলিত হৃদয়ের রক্তকনিকা খসে পড়া একটি মুহূর্ত ... । ... অসংখ্য তারকাখচিত উদার আকাশ থেকে হঠাৎ যদি কোন উল্কাপিণ্ড খসে পড়ে মানুষের চমক লাগার মত কিছুই নয়; কিন্তু উজ্জ্বল শশীকলার আলোর বন্যায় যদি রাহুগ্রাসে হঠাৎ বিষাদের কালো ছায়া নামে তাহলে সারা দুনিয়ার মানুষ ব্যথিত ব্যাকুল ও হতচকিত না হয়ে পারে না। বিশ্বের বিভিন্ন জাতির ইতিহাসে যেমনি রয়েছে সেই অতি শোকাবহ ও বিষাদের কালো দিন, তেমনি রয়েছে আমাদেরও। জাতীয় অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে আমরা ও জুম্ম জনগণ করে যাচ্ছি প্রতিবাদ, পাশবিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আর ষড়যন্ত্র ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে গড়ে তুলছি প্রতিরোধ। তাই স্বভাবতই যাবতীয় অত্যাচারী শক্তি ও ষড়যন্ত্রকারী ভণ্ডামীই হয়েছে আমাদের শত্রু। সেই ভণ্ড শত্রুদেরই বিষাক্ত নখের আঁচড়— জাতীয় ইতিহাসের সব চাইতে জঘন্যতম, ঘৃণ্যতম, ১০ই নভেম্বর— যা গোটা বিশ্বকে করেছে হতবাক আর জুম্ম জাতি হয়েছে সান্ত্বনাহীন ব্যথায় ব্যথিত ও শোকাভিভূত।

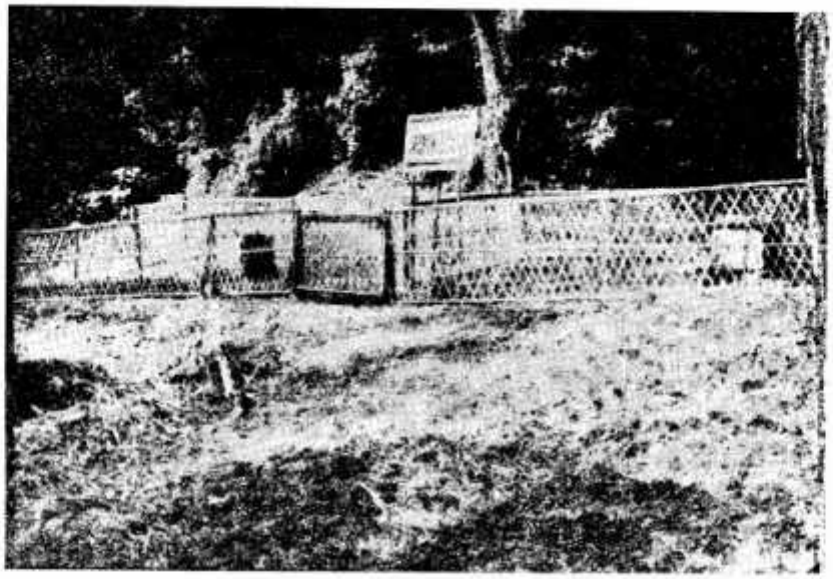

সমাধি ক্ষেত্র

জুম্মজাতির ইতিহাসে গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশচক্র একটি কলঙ্ক ও একটি জঘন্যতম ষড়যন্ত্র। অতি শোকাবহ ও মর্মান্তিক ১০ই নভেম্বর-এর কালো দিবসের স্মৃতি রোমন্থনের পূর্বাহ্নে জুম্মজাতির কুলাঙ্গার গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশচক্রের হীন চরিত্র ও উদ্দেশ্য উন্মোচন করা অপরিহার্য্য। গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র যদিও দীর্ঘদিন যাবৎ পার্টির পতাকাতলে সমবেত হয়ে কাজ করেছে তথাপি পার্টি নেতৃত্বকে কখনই মেনে নিতে পারেনি। দুর্নীতিবাজ, ক্ষমতা লিপ্সা, ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বেচ্ছাচারিতা, ব্যাভিচার, উচ্চাভিলাষ— এদের স্বভাব চরিত্রে মজ্জাগত ছিল। অথচ এই কুচক্রীরা শ্রদ্ধেয় নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে পশ্চাতে ও সংগোপনে অনেক বিরূপ মন্তব্য ও অপপ্রচার-যেমন কখনও বলতো ধর্মভীরু, কখনও বা আপোষ পন্থী, কখনও বলতো এক চোখা সর্বোপরি তার একনিষ্ঠ ও যোগ্যতর সহকর্মীদের বিশেষতঃ সন্তু লারমার বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার ও কুৎসা রটনা করতে বরাবরই প্রয়াসী ছিল। এবং সমগ্র পার্টিতে একটা প্রভাব বিস্তারের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। কিন্তু সামনাসামনি কোন মন্তব্য করার সংসাহস কারোর ছিলনা। পক্ষান্তরে তারাই উপযুক্ত, তারাই সর্বজান্তা,

তারাই জুম্মজাতির জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে দাবী করতো নির্লজ্জভাবে। তাই এই নেতৃত্বকে তারা বিষাক্ত আগাছা বলেই মনে করতো। একারণে তারা এই নেতৃত্বের প্রতি তাদেরই মধ্যে গালমন্দ করতো, ঘৃনাভরে ভর্ৎসনা করতো এবং মুখ বিকৃত করে অভিশাপ দিত আর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে সচেই থাকতো। কিন্তু শ্রদ্ধেয় নেতার পিতৃহৃদয় ও বিপ্লবী সত্ত্বা বরাবরই বিশ্বাস করতো — তাদের একদিন না একদিন সুমতি হবে এবং আত্ম সমীক্ষা করে একদিন সংপথে ফিরে আসবে। কিন্তু নেতার এই সহনশীলতা ও ক্ষমাশীল মনোভাবকে তারা দুর্বলতা বলে বিবেচনা করতো এবং পরিশেষে একদিন ক্ষমতা কেঁড়ে নেবার উন্মত্ততায় ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নিল। ১৯৮২ সালের জাতীয় সম্মেলনে তারা সশস্ত্র বাহিনীকে উস্কানী দিয়ে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পার্টির সর্বময় ক্ষমতা দখলের এক বিরাট অপচেষ্টা চালায়। কিন্তু সচেতন কর্মীবাহিনীর সামনে সে সব ষড়যন্ত্র ভণ্ডুল হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও পার্টি নেতৃত্ব তাদেরকে ক্ষমা প্রদর্শন পূর্বক পুণর্বার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পন করে। কিন্তু অবিশ্বাসের ভূত তাদের কায়-মন-বাক্য থেকে কখনও সরে পড়ল না। পুনরপি তারা ষড়যন্ত্রের পথে পা বাড়াতে থাকে। তারা পার্টির অভ্যন্তরে থেকে পার্টির বিরুদ্ধেই স্যাবোটেজ আরম্ভ করে দেয় এবং ভাতে মারা ও পানিতে মারার বিষবাষ্প সৃষ্টি করে। তার ফলে সমগ্র পার্টি ব্যাপী এক চরম সঙ্কট ও অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। তারপর এক সময় অকস্মাৎ ঘটলো বিস্ফোরণ। সেই বিস্ফোরণে পেটের নাড়িভুড়ি সব বেরিয়ে পড়ল এবং কুরুক্ষেত্রে কলিজা ফাটা আর্তনাদ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হলো। পরিণতিতে চক্রান্তকারীদের সার্বিক অবস্থা দ্রুত ডুবন্ত সূর্য্যের মতই যখন মুমূর্ষু হয়ে দেখা দিল তখন হন্যে হয়ে সমঝোতার পথ খুঁজতে থাকে। অতঃপর পার্টি নেতৃত্ব জাতির বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে "ক্ষমা করা ও ভুলে যাওয়া নীতির" ভিত্তিতে গণতন্ত্রের পথ সুগম করার মানসে এক সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু পৃথিবীতে যত ধর্মের কাহিনীই থাকুক না কেন চোরারা তা শুনতে কখনই রাজী নয়। তারা আরো নতুন কায়দায় ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে থাকে গোপনে গোপনে। সংক্ষেপে এই হলো ১০ই নভেম্বরের পূর্বকালীন অবস্থা।

এইভাবে চলতে থাকে একদিকে ষড়যন্ত্র, অন্যদিকে প্রতিরোধ। এমনিভাবে বর্ষা চলে গেল। শরতের আগমন ঘটলো। আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু করতে করতে একদিন শারদীয় নির্মল দিনগুলোও নিঃসমুখে বিদায় নিল। চক্রান্তকারীদের ষড়যন্ত্র তবুও যেন শেষ হলোনা। চক্রদের হোতা গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশের কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়ে আসার কথা ছিল কিন্তু তারা এলো না। এক সময় প্রকাশ জানালো সে তার অনুগামীদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না। তাই কেন্দ্রের সাহায্য চেয়ে এক জরুরী চিঠি পাঠালো। অনেকের সন্দেহ হলো যে, এ সমঝোতায় হয়তো চক্রান্তকারীরা আসতে নারাজ। এ ব্যাপারে নেতার কাছে পরামর্শ চাওয়া হলে শ্রদ্ধেয় নেতা ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তা নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পরামর্শ দিলেন। ক্রমেই সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে উঠলো। তাই তখনকার অস্থায়ী ব্যারাকটা অন্যত্র সরে নেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। কারণ চক্রদের হোতা গিরি ঐ অস্থায়ী ব্যারাক থেকেই চলে গিয়েছিল।

নভেম্বর পহলা সপ্তাহ। পূর্বের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কেন্দ্রীয় সদস্য বিপ ও সেক্টর কম্যাণ্ডার মেজর দেবাংশীর নেতৃত্বে বিশ্বাসঘাতক প্রকাশের চিঠি মূলে চক্রান্তকারীদের সাহায্য করতে ও উদ্ভূত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে একটা দল বাইরে চলে গেল এবং অস্থায়ী ব্যারাক স্থানান্তরিত করার কাজে আরো একটা দল বাইরে চলে গেল। হঠাৎ দুই নম্বর সেক্টর থেকে জরুরী ডাকে খবর এলো যে চক্রান্তকারীদের জনৈক কম্যাণ্ডার তাদের কাছে অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করেছে এবং সঙ্গে এই কথাও বলেছে যে চক্রান্তকারীরা আবারো চক্রান্ত করার পাঁয়তারা করছে। সপ্তাহের শেষ দিন। শোনা গেল বাংলাদেশ বেতার থেকে খবর পরিবেশিত হচ্ছে বঙ্গোপসাগরে জলোচ্ছাস হয়েছে। প্রথমে হুশিয়ারী সংকেত, পরে বিপদ সংকেত। এভাবে সংকেত নম্বর ৩, ৪, ৫ হতে এক সময় মহাবিপদ সংকেত দেয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে মেঘের আনাগোনা শুরু হয়েছে। আমরা ভাবলাম দুর্যোগ বুঝি এখনও কেটে যায়নি। প্রকৃতির এ ভয়ঙ্করতা ও রুদ্ররূপ হৈমন্তির দিনগুলোকেও বুঝিবা রেহাই দিচ্ছেনা। আমাদের সংকীর্তা আরও বাড়ানো হলো। বিশেষ প্রোগ্রামে শ্রদ্ধেয় লীডার একটু বাইরে গেলেন; কড়া প্রহরার মধ্যে তিনি ফিরে এলেন রাত্রে। সেদিন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিতে ভিজে এবং শীতল হাওয়ার শিকার হয়ে লীডার অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ। আবহাওয়া আরো খারাপ হয়েছে। প্রায়ই ঝড়ো হাওয়া এসে গোটা পরিবেশটাকে বিষন্ন করে তুলেছে। ডাঃ জুনির নিরবচ্ছিন্ন পরিচর্যা সত্ত্বেও লীডার নিরাময় হয়ে উঠতে পারলেন না। রাত প্রায় তিনটে লীডার অসুখে ছটফট করছেন, নিরব মুখে বিনীদ্র রজনী কাটিয়েছেন। আমরা যথেই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এদিকে সন্ত স্যারও প্রেসিডেন্ট এরশাদের ওরা অক্টোবরের ঘোষণার বিপরীতে খোলা চিঠি লিখতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাই আর অস্থায়ী ব্যারাকটা স্থানান্তরিত করা সম্ভব হলো না। নভেম্বরের ৯ তারিখ বৃষ্টির প্রকোপ কিছুটা কমেছে বটে কিন্তু প্রায় সময়টা জুড়ে বায়ু প্রবাহ বয়ে চলেছে। সারাক্ষণ কাকের কা-কা-রবে প্রকৃতি যেন কিসের এক আশংকায় বিমর্ষ হয়ে পড়েছে। বিকেলে লীডারকে কিছু বিস্কুট খাওয়াবার চেষ্টা করা হলো কিন্তু তিনি খেতে পারলেননা। ক্রমে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। সবাই যার যার বিছানায় শুয়ে পড়েছে। রাত ৮টা নাগাদ পাশের ঝিরিতে কি যেন একটা গড়িয়ে পড়ার শব্দ শোনা গেল। দু'জন সৈনিক টর্চলাইটের আলো দিয়ে জায়গাটা চার্জ করে এলো। কিছুই দেখতে না পেয়ে প্রকৃতির ঘটনা ভেবে তারাও

ঘুমিয়ে পড়লো। রাত ১১-১২টা পর্যন্ত আমরা ৪ জন প্রহরায় ছিলাম। তখনও প্রায় ভারী কিন্তু শুষ্ক হাওয়া বয়ে চলেছিল। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে জোছনার আলো যেন পৃথিবীর সাথে লুকোচুরি খেলছিল। তখন কেই বা জানতো প্রকৃতির মধ্যে কোন বিভীষিকাময় ঘটনা কারোর জন্য প্রতীক্ষা করছে কিনা। প্রহরী বদল করে আমরা শুয়ে পড়লাম। আমার পাশের সঙ্গীটার সামান্য জ্বর ছিল। অতএব তাকে কোন রকম বিরক্তি না করে একটু অসুবিধার মধ্যে হলেও ঘুমিয়ে পড়লাম।

১০ই নভেম্বরের ভোর রাত সাড়ে তিনটে বাজতে তখনও কিছু বাকী। গভীর তন্দ্রা থেকে বিদঘুটে এক স্বপ্নের শিহরণে আমি হঠাৎ জেগে গেলাম। শয্যার উপর বসে চারিদিকে একটুখানি তাকালাম—দেখলাম প্রহরী বদল হচ্ছে। হাতের ঘড়িটা টর্চের আলোতে একটুখানি দেখে নিয়ে আবার গা এলিয়ে দিলাম। ভাবলাম বোধ করি একটু অসুবিধার মধ্যে ঘুমুতে গিয়ে এভাবে দুঃস্বপ্নের মধ্যে ঘুম ভাঙলো। তারপর আস্তে আস্তে ঘুমের তন্দ্রা পাচ্ছে। পায়ের কাছে একটু কড়মড় শব্দ হওয়াতে টের পেলাম পিন্‌হোল টর্চের আলো দিয়ে কে যেন বাইরে যাচ্ছে— আর একটু পরেই অকস্মাৎ কারবাইনের ব্রাশ ফায়ার হলো ট-ট-ট-টশ্‌। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে পায়ের দিকের মাটিতে লাইং পজিশন নিলাম। "মুই বিপন, বিপন," কথাটা শুনতেই তাকিয়ে দেখি বিপনদা "ওমা" "ওমা", করতে করতে উঠোনে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। কিছু একটা বোধগম্য না হতেই চিৎকার দিয়ে বললাম কি হয়েছে, কি হয়েছে! তখন উত্তর-পশ্চিম কোণ-এর পায়খানা ঘরের রাস্তার মুখ (বড় ব্যারাকে একদম সন্নিকটে আমাদের L M G ম্যানের খুব কাছাকাছি) থেকে একজন সোজা দক্ষিণ দিকে লীডারকে লক্ষ্য করে ক্রমাগত ব্রাশ ফায়ার করছে, অন্যজন আমাকে ও সন্তু স্যারকে লক্ষ্য করে ব্রাশ ফায়ার করে চলেছে। আর বিশ্বাসঘাতকেরা ইয়া আলী, ইয়া আলী ...... শব্দ করছে এবং আবুলা এডভান্স, এডভান্স করে বিকৃত গলার স্বরে শব্দগুলো উচ্চারণ করছে। ততক্ষণে আরও ৪/৫ জন আমাদের ব্যারাকের খুব কাছে (আমার থেকে ৫/৬ গজ দূরত্বে) এসে একসাথে ব্রাশ ফায়ার শুরু করে দিয়েছে। বোঝা গেল চক্রান্তকারীরা বাংলাদেশ আর্মি ভান করে বিশ্বাসঘাতকতামূলক আক্রমন করতে এসেছে। ট্রেঞ্চে গিয়ে পজিশন নিলাম। সেখানে সন্তু স্যার ও মিহিরদাকে নাগাল পেলাম। ততক্ষনে সেকেন্ড লেফটেনান্ট মৃন্ময় ও কর্পোরেল অর্জুন উত্তর পার্শ্বের ট্রেঞ্চগুলোতে পজিশন নিতে গিয়ে সরাসরি শত্রুদের ফায়ারের মুখে পড়ে ইহলীলা সংবরন করল। ঐ দুটো অস্থায়ী ব্যারাকে আমরা ২০/২২ জন মানুষ ছিলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে সবচাইতে অসুবিধার দিকটি ছিল এই যে, শত্রুরা রয়েছে উত্তর প্রান্তে আর আমরা পজিশন নিতে বাধ্য হয়েছি দক্ষিণ প্রান্তে মাঝখানে রয়েগেছে দুটো ব্যারাক ও বাদবাকী মানুষগুলো। তাই বাদবাকী মানুষগুলোর কথা ভেবে আমরা ঠিকমত ফায়ারই করতে পারছিলামনা। কারণ সেই অন্ধকারে কাকেও সঠিক ভাবে চেনা যাচ্ছিল না।

আমরা অস্থায়ীভাবে তিন ভাগে ভাগ হয়ে অবস্থান করছিলাম। পাহাড়ের সর্বোচ্চ উত্তর দক্ষিণ লম্বালম্বি ব্যারাক, সেখান থেকে ৪০/৪৫ গজ নিচে পাহাড়ের মাঝামাঝিতে সামনাসামনি দুটো ব্যারাক, ব্যারাকের পাশে দক্ষিন মুখী হয়ে একজন সেন্ট্রী থাকে। সেখানে থেকে ২০/২৫ গজ নিচের ঝর্ণার কাছাকাছিতে পাকঘর কাম ব্যারাক দুটো পাশাপাশি, সেদিকে পূর্বমুখী একজন সেন্ট্রী ও উপরের ব্যারাকে উত্তর দক্ষিণ হয়ে দুটো সেন্ট্রি মিলে সর্বমোট ৪ জন সেন্ট্রি সব সময় থাকতো। কিন্তু শত্রুরা মুহুর্মুহু ফায়ার ও হাত বোমার আওয়াজ করতে করতে মধ্য ব্যারাকের উঠোন বরাবর ও ব্যারাকের নিচে ঢুকে পড়েছিল। উপর্যুপরি ব্রাশ ফায়ার ও হাত বোমার বিস্ফোরণে মনে হচ্ছিল প্রতিহিংসার উন্মত্ততায় শত্রুরা যেন প্রতিটি ঝোপঝাড়কেও ধ্বংস করে দিতে চাইছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ট্রেঞ্চের কাছাকাছিতে দুটো হাত বোমা ফেটে যায় এবং প্রবল বেগে গোলা বর্ষণ করতে থাকে। ফিল্ড কম্যাণ্ডার সন্তু স্যার উপরের ফাইটিং গ্রুপ দিয়ে পাল্টা আক্রমন করতে সংকেত দিতে সচেষ্ট থাকেন। ইতিমধ্যে কর্পোরেল জ্ঞানানকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা ও পার্টির বিভিন্ন ইউনিটের সাথে যোগাযোগ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানেও সন্তু স্যার ব্যাপৃত থাকেন। এমন সময় উপর থেকে আমাদের ফাইটিং গ্রুপ এসে শত্রুদেরকে পাল্টা আক্রমন করতে শুরু করে। চতুর্দিক থেকে ফায়ারের আওয়াজ শুনে শত্রুরা মন্ত্রী—মন্ত্রী বলে ডাকাডাকি শুরু করে দেয় এবং কয়েকবার লম্বা লম্বা বাঁশি বাজানোর পর পূর্বদিকের ছড়া (ঝর্ণা) বেয়ে চলে যায়। কিন্তু ততক্ষনে লীডার সহ ৮ জন ঘটনাস্থলে শহীদ হন এবং কর্পোরেল সৌমিত্র ও কর্পোরেল বকুল আহত হয়। কিন্তু সৌমিত্র ঘোরতর ভাবে আহত হয়ে লীডারের জায়গা থেকে সামান্য দূরের ঝোপে আড়াল করা একটা গর্তে নিজেকে কোন মতে বাঁচিয়ে রাখে। তিনি আহত অবস্থায় দুইদিন বেঁচে থাকেন। তাঁর প্রত্যক্ষ বিবরণ থেকে জানা যায়—লীডার প্রথমে পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন কিন্তু অসুস্থ শরীর ও দুর্বলতা হেতু সরে যেতে পারেননি। শত্রুরা ব্যারাকের ভিতরে ঢুকে লীডারকে আহতবস্থায় দেখতে পায়। তখন লীডার হত্যাকারীদের সাথে কথা বলার সুযোগ পান। লীডার প্রথমে বলেন—"কি, তোমাদেরকে ক্ষমা করে আমরা কি অন্যায় করেছি? আমাকে কিংবা তোমাদের বন্ধুদের মেরে জাতি কি মুক্ত হবে? যাক তোমরা প্ররোচিত ও উত্তেজিত হয়ে যাই করোনা কেন জাতির দুর্দশাকে তোমরা কখনও ভুলে যেও না আর জাতির এ আন্দোলনকে কখনও বানচাল হতে দিও না"। লীডারের কথা শুনে উপস্থিত দু'জন শত্রু নীরবে চলে যায়, তারা আর ফিরে আসেনি। ততক্ষনে তাদের মধ্যে কড়া ভাষায় কথা কাটাকাটি হতে শোনা যায় এবং সমস্বর কণ্ঠে "ও যেদং ভিলে যেদং" শব্দ শোনা যায়। সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎগতিতে কে একজন

এসে লীডারের গায়ের উপর উঠে কোন কথা না বলে ব্রাশ ফায়ার করে দ্রুত পালিয়ে যায়। তার কিছুক্ষন পরেই ঐ জায়গাটি আমাদের পুর্নদখলে আসে এবং সমস্ত শত্রুদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কর্মীরা এসে শ্রদ্ধেয় লীডারের বুক জড়িয়ে ধরে এবং আবেগাকুল ও উদ্বেলিত কণ্ঠে বলতে থাকে "স্যার — ও স্যার আমরা তো তোমাকে বাঁচাতে পারলাম না। তুমি ছাড়া আমরা কোথায় থাকবো স্যার"। শ্রদ্ধেয় লীডারের বুক তখনও উষ্ণ ছিল। তিনি কোন মতে চোখ মেলে তাকালেন এবং হাত দিয়ে কি যেন সান্ত্বনা দিতে চাইলেন কিন্তু কোন কথা বেরুল না. কোন অশ্রু ঝড়লোনা। শুধু বুকের তাজা রক্ত বিছানা গড়িয়া টপ্ টপ্ করে ঝড়ে পড়তে লাগলো। তারপর চোখ খোলা রেখে লম্বা এক বুক ভরা শ্বাস নিয়ে অতি স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় চিরশান্তিত হয়ে রইলেন ..... । নির্মম এই পৃথিবী যিনি নিপীড়িত, নির্যাতিত ও শোষিত জাতির সেবায় নিজের শেষ রক্ত বিন্দুটুকুও দান করে গেলেন সেই জাতি তাদের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূতকে এক ফোটা ঔষধ খাওয়াবার সুযোগ পেলনা।

তাঁর স্বাভাবিক উজ্জল চেহারা তাঁর খোলা চোখ যেন তিনি এখনও স্বাভাবিক। দেখে মনে হয় মৃত্যুর পূর্বক্ষনেও কোন প্রকার ভয়ভীতি তাঁকে যেমন ছোঁয়াতে পারেনি, তেমনি জন্মভূমির মায়া প্রকৃতির আলো বাতাস দু'চোখ ভরে দেখার সাধ এখনও মিটেনি। উত্তপ্ত রক্ত প্রবাহে বিদ্যুৎ খেলানো শান্তি বাহিনীর বীর যোদ্ধারা শত্রুকে তাড়া করে ফিরে এসেই জিজ্ঞেস করে স্যার কোথায়? যখন দেখে স্যারের নিষ্প্রান দেহখানি পড়ে রয়েছে তখন কেউ আর অশ্রু সংবরণ করতে পারে না। কান্না জড়িত কণ্ঠে বলে "শেষ .. ...সব শেষ চক্রান্তকারী গুণ্ডারা আজ স্যারকে হত্যা করে আন্দোলনকে ধ্বংস করলো? তোমাদের একদিন এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।" সেদিনের কান্না. প্রিয় নেতাকে হারানোর ব্যথা, সেই চিরবাঞ্ছিত দৃষ্টি শক্তিকে হারানোর চাইতেও গভীর ও মর্মন্তুদ। যে মানুষটি জুম্ম জাতির মুক্তি কামনায় বছরের পর বছর কঠোর সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন, যে বিপ্লবী কণ্ঠ ছিল দুনিয়ার সমস্ত অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার সেই অগ্রনায়ক, জাতির কর্ণধার, জাতীয় চেতনার আলোকবর্তিকা যেন তার সমস্ত সলিতা বিসর্জন দিয়ে নিজের দায়িত্ব সমাপন করলেন। কিন্তু জাতিকে তার আরো অনেক কিছুই দিবার মত ছিল। .....সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে ..... হৃদয়ের গভীরতম আবেগে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রয়েছে দেখে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করলাম— অশ্রু মুছে নিলাম। সান্ত্বনা দেবার জন্য কিছু বলতে যেয়েই কণ্ঠরোধ হয়ে এলো যেন বিধাতা সেদিন সমস্ত বাক্ শক্তিকে কেড়ে নিয়েছেন। সমস্ত দেহটা অবসন্ন বোধ করছি। মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো। মিহিরদা সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন— "যা হবার তো হয়েই গেছে সেটা ফেরাবার আর নেই। তোমরা ধৈর্য্য ধরো। আর আহত সৌমিত্রকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করো।" অবশেষে সমস্ত শক্তি দিয়ে আত্মসংবরণ করলাম। লীডারের গোছানো জিনিসগুলো এক জায়গায় জড়ো করে প্রয়াত নেতার মরদেহের উপর কাপড় জড়িয়ে দিলাম। কিন্তু মুখ ঢেকে দেবার সাহস হলো না। যেই মুখ উগ্র ধর্মান্ধ স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার ও উগ্র বাঙ্গালী মুসলমান জাতীয়তাবাদ ও সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ দুর্গ গড়ে তুলেছিল, সেই অদ্ভুতপুর্ব মুখখানি ঢাকা দিতে সাহস হলোনা।

সেদিনের আকাশ ছিল মেঘলা, মাঝে মাঝে ঝড়ো হাওয়া এসে সমস্ত পরিবেশটাকে স্যাঁতস্যাতে করে রেখেছিল। ব্যারাকের সমস্ত জিনিষপত্র বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়ানো ছিটানো। উঠানে ও মেঝেতে হাত বোমার আঘাতে ক্ষত বিক্ষত কালো দাগগুলো সমস্ত পরিবেশটাকে কলুষিত করে রেখেছিল। বেপরোয়া গুলির আঘাতে সমস্ত কাপড়-চোপড় ছিন্নভিন্ন হয়ে এলো পাথারি পড়ে রয়েছে ; ইতস্তত: ভাবে গোলাগুলি পড়ে রয়েছে। ব্যারাকের ভিতরে লাশ, উঠানে লাশ, রাস্তার উপরে লাশ সবাই যেন বিছানাহীন শয্যায় অনাদরে লুটোপুটি দিচ্ছে। আমরা সব মরদেহগুলো এক জায়গায় জড়ো করে কাফন মুড়িয়ে দিচ্ছিলাম দেখতে পেলাম চক্রান্তকারী শত্রুরা ঐ মরদেহগুলোর উপর অহেতুক গুলি বর্ষণ করে তাদের প্রতিহিংসার জ্বাল মিটিয়েছে। পাষাণতার এই কুলক্ষণ উন্মত্ত পাগলা কুকুরকেও অনায়সে হার মানিয়ে দেবে। তখনও বাতাসে সর্বত্রই পোড়া বারুদের উগ্র গন্ধ। প্রকৃতির বিমর্ষতাও যেন নাছোরবান্দা। মৃদু সঞ্চরমান মেঘের ফাঁকে ফাঁকে কখনও এক ঝলক রোদ এসে ধরণীর অশ্রু মুছিয়ে দেবে এটুকু ক্ষীণ আশাও সেদিন ছিলনা। মাননীয় জিল্লু কম্যাণ্ডার সন্তু লারমা মিহিরদাকে আহতদের চিকিৎসার ভার দিলেন। আশেপাশের সমস্ত এলাকা চার্জ করে দেবার নির্দেশ দিলেন আমাদেরকে। তার পরদিন অন্যান্য সব ইউনিটগুলোতে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে দ্রুত খবর পাঠাবার ব্যবস্থা নিলেন এবং ঔষধ সংগ্রহের জন্য লোক নিয়োগ করলেন। ইতিমধ্যে দু সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে আশেপাশে বন্ধুবান্ধবরা দলে দলে এসে ভীড় জমাতে শুরু করেছে। সবাই প্রয়াত নেতাকে শেষবারের মত দেখতে চায়। অবশেষে সন্তু স্যার এসে পৌছলে উপস্থিত লোকজনদের প্রিয় নেতার শেষ দর্শনের অনুমতি দিলেন। ব্যারাকের ভিতরে সবাই এসে দাঁড়িয়েছে। একজন বৃদ্ধ লোক এসে প্রয়াত নেতার কাফন খুলে দেখলেন। তাঁর গুলি বিদ্ধ ঝাঁঝড়া বুক দেখে আস্তে ধীরে বসে পড়লেন এবং কপালে হাত রেখে অশ্রু সিক্ত বিস্ফারিত নয়নে বিলাপ করতে শুরু করলেন—"হে দেশ-মাতৃকার প্রকৃত বীর সন্তান! আমরা জানি শত প্রলোভন তোমাকে মোহিত করতে পারেনি ; একটা আগ্রাসী জাতির যাবতীয় হুমকি তোমাকে বিচলিত করতে পারেনি ; তোমার মানসিক দৃঢ়তায় কোন-দিন ভাঁটা পড়তে দেখিনি। তোমার স্বার্থ ত্যাগ আমাদেরকে অনু-

প্রাণিত করেছিল, তোমার প্রেরণায় গোটা জাতি আজ বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে সাহসী হয়েছে তবুও তোমার শত্রুরা জাতির কুলাঙ্গারেরা তোমাকে এভাবে হত্যা করলো"। তিনি ধুঁকরে কেঁদে উঠলেন। সবাই অশ্রুসজল নেত্রে এক বাক্যে বলে উঠলো — সত্যিই বিনা মেঘে বজ্রঘাতের মতই হয়েছে। সবাই বলে উঠলো – হে ভগবান, তুমি এই খুনীদের, এই বেইমানদের বিচার করো। জনতার সারি থেকে আরো একজন বৃদ্ধ এসে অশ্রু মুছে নিয়ে প্রয়াত নেতার কপালে হাত রেখে বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ বলে আশীর্বাদ দিতে দিতে বললেন— "তুমি তো যেখানেই যাওনা কেন সবসময় "সর্বের সত্তা সুখিতো ভবন্তু (সকল প্রাণী সুখী হোক) বলে ধর্মীয় বাণী প্রচার করতে, কতবার ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কাজ করতে দেখেছি, কাকেও তুমি হিংসা করতে না, কিন্তু তবুও আজ তোমার শত্রুরা হিংসা করে হত্যা করলো বলে তুমি দুঃখ করোনা। তুমি স্বর্গবাসী হবে; পরিনির্বান লাভ করবে। কোন প্রাণীকে তুমি হত্যা করতে না। তোমার এই সৎকর্মের ফল ইহ কালে না হলেও পরকালে ভোগ করবে।" উপস্থিত জনতা সবাই সমস্বরে আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললো –"শান্তি বাহিনী-ভায়েরা, মূর্খ শিষ্যের চেয়ে পণ্ডিত শত্রুও ভাল। গৌতম বুদ্ধের এই উপদেশটা কখনও ভুলে যেয়ো না। যারা মূর্খ, যারা বেঈমান তাদেরকে ক্ষমা করার কোন দরকার নেই।

ততক্ষনে আশে পাশে কর্মরত বাহিনীর সকল সদস্যগণ এসে জড়ো হয়েছেন। সবাই পুরো ব্যাপারটা জেনে নেবার জন্য নানা প্রশ্ন করছেন। পরে উপস্থিত জনতা সরে গেলে প্রিয় নেতার বিদেহী আত্মার প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শনের জন্য নীরবে অশ্রু সিক্ত নয়নে ব্যারাকে উঠে এসেছেন। এভাবে কর্মীরা যখন আসতো প্রিয় নেতা তাড়াতাড়ি এসে অভ্যর্থনা জানাতেন। সবারের সাথে করমর্দন করতেন এবং আন্তরিকভাবে আলিঙ্গন করতেন। তারপরে তাঁর পাশে বসিয়ে বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে তৎপর হয়ে পড়তেন। কিছুক্ষন বিশ্রামের পর কুশল বার্তা ও পরিস্থিতির খবরা-খবরগুলো অতি নিখুঁত ভাবে জেনে নিতেন। তাঁর এ বিনয়ী মনোভাব, মহানুভবতা ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ হয়ে যেত। পার্থিব জগতের দুঃখ বেদনা অভাব অভিযোগ সব কিছুই ভুলে যেত তাঁর এই আন্তরিক ব্যবহারে। তাঁর সাথে আলাপ করে প্রত্যেকটি কর্মী নতুন প্রেরণা লাভ করে উজ্জীবিত হয়ে ফিরে যেত। কিন্তু এই দিনে কত কর্মী এসে জড়ো হয়েছে সে প্রেরণা আর কেউ পেলনা। কারো সাথে করমর্দন হলো না, কাকেও আলিঙ্গন করলেন না। তিনি রয়েছেন তারই প্রিয় বিছানায় নির্বিকার চিত্তে; চির শায়িত হয়ে …… কোন রকম উত্তেজনা, কোন রকম শোকার্ত কান্না তাঁকে আর বিচলিত করবে না। …… সবাই ধীরে ধীরে তাঁর শবদেহের পাশে হাতিয়ার রেখে দুই হাত জোড় করে প্রণাম জানিয়ে কৃতজ্ঞতার সাথে সম্মান জানাচ্ছেন, কেউ কেউ দুপায়ে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞাসা করছেন – স্যার, তুমি আর আদর করবে না স্যার? তুমি কি আলাপ করার জন্য আর কাছে ডাকবে না স্যার! হায়রে অবুঝ হৃদয়! এত কিছু দেখেও কি বিশ্বাস করতে পারছো না? …… তবুও তো বাস্তবতাকে মানতে হয়। তারপর কয়েকজনে মিলে আমরা তাঁর জিনিষপত্রগুলো তছনছ করে দেখলাম। অনুসন্ধান করে দেখা গেল চক্রান্তকারী শয়তানেরা প্রিয় লীডার ও সদ্য স্যাটের সঙ্গের যাবতীয় দলিল পত্র সহ অন্যান্য জিনিষপত্রাদি প্রায়ই লুঠ করে নিয়ে গেছে। সেই সঙ্গে বেশ কয়েকখানা হাতিয়ার গোলাবারুদ সহ অন্যান্য অনেকেরই জিনিষ পত্রাদি নিয়ে পালিয়ে গেছে। অবশিষ্টাংশের মধ্যে দেখতে পেলাম তাঁর ব্যবহারের একটা কেটলি, একটা পানির কন্টেনার ও একটা পানির চোঙ্গা তখনও পানি ভর্তি অবস্থায়, পড়ে আছে তাঁর ব্যবহারের জন্য মাত্র দুটো কম্বল, একটা গিলাপ কাপড় যা দিয়ে বালিশ বানানো, একটা প্যান্ট, একটা শার্ট ও এক জোড়া মোজা গায়ে জড়ানো। তাছাড়া বহু পুরানো এক জোড়া জুতা, একটা পুরানো গেঞ্জি একটা লুঙ্গি ও একটা দেশীয় ঝোলা রয়েছে। ফেলে যাওয়া তাঁর সুটকেসটা খুলে দেখা গেল—অনেকগুলো বই, কিছু ঔষধ, একটা ডায়েরী ও একটা ছোট ফটো এলবাম ও শিব কলম কয়েকটা। দেখলাম তাঁর ডায়েরীর প্রথম পাতায় লেখা আছে "মহান জুম্মজন-গণের আন্দোলন দীর্ঘজীবি হোক, সারা দুনিয়ার নিপীড়িত জনগণ এক হও। জয় আমাদের হবেই-হবে"। তাঁর প্রিয় ডায়েরীর সাথে আরো রয়েছে অনেকগুলো পেপার কাটিং সেগুলো তিনি খুবই সযত্নে সংরক্ষণ করতেন। সংস্কৃতিবান ও ছিমছাম জীবনের অধিকারী প্রিয় নেতার এ্যালবামে দেখা গেলে-তাঁর অতি প্রিয় দু'টি সন্তানের ছবি, তাছাড়া ছাত্র জীবনের ও শিক্ষক জীবনের এবং এল এল বি পাশ করে এডভোকেট হওয়াকালীন তোলা সযত্নে রাখা ফটো। তাঁর সেই ছবিগুলো দেখে দীর্ঘদিন কারাভোগের পর দীঘিনালা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে প্রথম দেখা স্মৃতিগুলো আমাকে মনে করিয়ে দিল। এছাড়া আরো অনেকগুলো ফটো একের পর এক করে দেখছিলাম তখন হঠাৎ একজন নীরবতা ভঙ্গ করে বলে উঠলো— "এমনিতে এ স্যার অতিরিক্ত দয়ালু। কি প্রয়োজন ছিল এ চক্রান্তকারী শত্রুদের ক্ষমা দেয়ার।" সে কথা শুনে অন্য একজন তাড়াতাড়ি বলে উঠলো— "দেখ ভাই, ভুল ধরলে অনেক কিছু পাওয়া যায় নেতার মহৎ হৃদয়কেও দোষ দেয়া যায় কিন্তু তাঁর এই ক্ষমাগুণ না থাকলে এতক্ষনে আমাদের কার কি অবস্থা হতো তার কি ইয়ত্তা আছে। তাঁর মত মহৎ হৃদয় না থাকলে আমাদের শান্তি পেতে পেতে মাথার চুলও চলে যেত। কত ধৈর্য্য ধরে তিনি আমাদেরকে বার বার বুঝাতেন, শিখাতেন তাঁর সুস্থ চিন্তাধারা, তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি না হলে আমাদের এ জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটতো না, জুম্মজাতি এতক্ষন ধ্বংস হয়ে যেত।" এ সব কথা

শুনার পর ঐ দলের কম্যাণ্ডার বলে উঠলেন— "দেখ ভায়েরা, আমাদের এই মহান নেতার অবদান ও মহত্ত্ব তাঁর শত্রুরাও অস্বীকার করতে পারবে না। তিনি ছিলেন খাঁটি বৌদ্ধ তোমরা নিজেরাই তো জান তিনি একটা পিপড়াকেও মারতে দিতেন না। ঘাটের ইছা ও কাঁকড়াগুলোকে মারতে দিতেন না বলে ওরা আমাদেরকে ভয় করতো না, পায়ের কাছে কাছে এসে আহার যোগাড় করতো। দেখ দয়া করলে পশু পক্ষীরা পর্যন্ত পোষ মানে। আজ নেতার এ মৃত্যুতে জাতি তার সব চাইতে বড় সম্মানিত সম্পদটাই হারালো। এ ক্ষতি কোন দিন পূরণ হবার নয়। তাঁর আন্দোলনের জ্ঞান, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম, আইন ইত্যাদি সর্বজ্ঞানে গুনান্বিত মানুষ জাতি আর কোন দিন পাবে কিনা সন্দেহ। তোমরা দুর্বল হয়ো না ভায়েরা, বাস্তব জগত থেকে তার অস্তিত্ব মুছে যেতে পারে কিন্তু তাঁর অবদান ও তাঁর অমরবাণী আমাদের কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। এসো ভায়েরা নেতার মরদেহ ছুঁইয়ে আমরা নূতন করে শপথ নিই এই মহান নেতার স্বপ্ন আমরা বাস্তবায়িত করবোই।" সবাই এক সাথে বলে উঠলো— "জন সংহতি সমিতি জিন্দাবাদ, শান্তি বাহিনী জিন্দাবাদ, জুম্ম জনগণ দীর্ঘজীবি হোক। প্রিয় নেতার ঐতিহাসিক অবদান অমর হোক অমর হোক"।

দেখতে দেখতে দিবসের শেষ ভাগ নেমে এলো। বিকেল ৫টা বেজে আরও কিছুক্ষণ গড়িয়ে গেছে। উপস্থিত জনতা ও বাহিনীর সদস্যরা মিলে মরদেহগুলো দাহণ করার ব্যবস্থা নেয়া হলো। চারিদিকের উঁচু উঁচু পাহাড়ের কোল ঘেঁষে আঁকাবাঁকা হয়ে একটা ছড়া (ঝর্ণা) চলে গেছে। ছড়ার দুইধারে মাথা উঁচু উঁচু করে দাঁড়ানো তরুরাশির ছায়াই বল্লতাগুল্মের ঘেরা একটুখানি সমতল জায়গা। ঐ জায়গাটাই সাফ করে মরদেহগুলোর সমাধি বানানো হয়েছে। তারপর এক এক করে মরদেহগুলো শশ্মানে নিয়ে আসা হচ্ছে। সবাইকে নিয়ে আসা হলে মেজর পেলের নেতৃত্বে শান্তি বাহিনীর সদস্যরা ও উপস্থিত জনতা সবাই প্রথমে লীডারের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করেন এবং পরে অন্যান্যদেরকেও করা হয়। তারপর জনতার পক্ষ থেকে অন্যান্য মরদেহগুলো পরিচয় করিয়ে দেবার অনুরোধ জানানো হয়। তখন দলের পক্ষ থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ একজন সদস্য সংক্ষিপ্তভাবে শহীদের পরিচিতি জানিয়ে দিলেন এইভাবে— এই হচ্ছেন আমাদের নিপীড়িত নির্যাতিত ও শোষিত জুম্ম জনগণের নেতা লার্মা। যিনি জুম্ম জনগণের জাতীয় জাগরণ এনে দিয়েছেন। যিনি জনসংহতি সমিতি প্রতিষ্ঠা করে আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। দশ ভাষা ভাষী জুম্ম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। জুম্ম জাতির জাগরণের অগ্রদূত, জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা চিন্তাবিদ, নিপীড়িত মানুষের একনিষ্ঠ বন্ধু মহান দেশ প্রেমিক ও রাজনীতিবিদ আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তিনি দিয়ে গেছেন মুক্তির মন্ত্র। ব্যক্তিগত জীবনে আমাদের নেতা লারমা ভদ্র, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, স্নেহবৎসল, অতিথিপরায়ণ, সুশৃঙ্খল, কর্তব্যনিষ্ঠা সদালাপী ছিলেন। তিনি বিবাহিত। তাঁর এক পুত্র ও এক কন্যা। শোক সন্তপ্ত তাঁর পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনা জানাই।

মেজর পরিমল বিকাশ চাকমার মরদেহ হচ্ছে এটি। ছাত্র অবস্থা থেকে তিনি বিলুপ্ত প্রায় জুম্ম জাতির কথা ভাবতেন। তাই ছাত্র জীবন থেকেই তিনি দেশ সেবায় আত্মনিমগ্ন ছিলেন। কলেজ জীবন শেষ করার পরই তিনি সক্রিয়ভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি একজন অতি বিশ্বস্ত, সৎ, বিনয়ী, নিরলস দেশ প্রেমিক ছিলেন। দীর্ঘ এক যুগ ধরে তিনি প্রয়াত নেতার পাশে পাশে নিরাপত্তা ও সেবা শুশ্রূষার দায়িত্বভার নিজেই বহন করতেন। শত্রুরা সর্বপ্রথম তাঁর উপরেই গুলিবর্ষণ করেছিল। তিনি সদ্য বিবাহিত ছিলেন।

এই হচ্ছেন শুভেন্দু প্রবাস লারমা (তুফান)। তিনি প্রয়াত নেতার বয়োজ্যেষ্ঠ ভাই। মাত্র গতকাল তিনি প্রয়াত নেতার অসুখের খবর শুনে তাঁকে দেখতে এসেছিলেন। যুব সমিতির তিনি একজন আঞ্চলিক পরিচালক ও আঞ্চলিক কমিটির একজন নেতৃস্থানীয় সদস্য। জনসংহতি সমিতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। এ পর্যন্ত তিনি একনিষ্ঠতার সাথে পার্টি প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান ও জনদরদী মানুষ। তাঁর অঞ্চলের অনেক মানুষকে তিনি নিজের সম্পত্তি দিয়ে নিজের শক্তি দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। চক্রান্তকারী পলাশের ভাইদের যাবতীয় পড়াশুনার ভার তিনিই বহন করেছিলেন। কিন্তু বিধাতার নির্মম পরিহাস সেই পলাশ চক্র তাঁর মরদেহের উপর অহেতুক গুলি বর্ষণ করে সারা দেহখানি ঝাঁঝড়া করে দিয়ে গেছে। তিনি বিবাহিত। স্ত্রী পত্নী, দুই মেয়ে ও এক ছেলেকে রেখে তিনি শহীদ হয়েছেন।

তারপরেই গ্রাম পঞ্চায়েৎ বিভাগের সহকারী পরিচালক অপর্ণা চরণ চাকমার (সৈকত) মরদেহখানি সকলের সামনে খুলে ধরলেন। সে সময় তাঁর পরিবারের আত্মীয় স্বজনেরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁর ডান চোখের ভ্রুতেই গুলিবিদ্ধ হয়েছিল। তাঁকে দেখার সাথে সাথে তাঁর শোক সন্তপ্ত পত্নী, দুই ছেলে ও এক কন্যা হো-হো-করে আর্তনাদ করে উঠলো। পিতৃহারা সন্তানেরা মায়ের বুক ছেড়ে বুক ফাটা ক্রন্দনে বাপকে ধরতে চাই—ধরনীর বুকে স্বামী হারা মা সন্তানদের করুণ আকুতি দেখে মূর্ছাহত হয়ে পড়ে। এই মর্মভেদী দৃশ্য থেকে উপস্থিত লোকজন তাদেরকে বোঝাবার ভাষা হারিয়ে তারাও কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। মা ও ছেলে মেয়েদের অবস্থা দেখে বয়োজ্যেষ্ঠ কর্মীটি অস্থির হয়ে পড়েন এবং কোন মতে আত্মসংবরণ করে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠে বলেন তিনি ছিলেন একজন উচ্চ শিক্ষিত মানুষ। যাগড়া ছড়ি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার সময় তিনি বাংলাদেশ সেনা-

বাহিনীর হাতে লাঞ্ছিত ও হৃত হন। তারা স্বামী স্ত্রী দু'জনেই ছিলেন দেশ প্রেমিক। একনিষ্ঠ, বিশ্বস্ত ও বুদ্ধি দীপ্ত এই বিপ্লবী বিচক্ষনতা ও যোগ্যতার সাথে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব এযাবৎ সুষ্ঠুভাবে পালন করে গেছেন। রাঙ্গামাটি শাহ হাই স্কুলে শিক্ষকতা করার সময় থেকে তিনি জুম্ম জনগনের জাতীয় সংগ্রামের মহান কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে পড়েন এবং পাহাড়ী ছাত্র সমিতির ছাত্র আন্দোলনে একজন পরামর্শ-দাতাও ছিলেন। তিনি সব সময় বৌদ্ধ ধর্মের নীতির সাথে দলীয় নীতির সমন্বয় সাধন করার জন্য চেষ্টা করতেন। আজই তাঁরই স্ব-বান্ধবদের সাথে মিলিত হবার কথা ছিল। কিন্তু সে মিলন আর হলো না। সমস্ত আত্মীয় পরিজনদের মন আজ রিক্ত হাহাকারে ভরপুর। আমরা তাঁর আত্মীয় পরিজনদের সমবেদনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি।

কল্যাণময় শীস (জুনি) ছিলেন হাসিখুশী স্বভাবের পিতার একমাত্র সন্তান। তিনি গ্রাম পঞ্চায়েত বিভাগের আঞ্চলিক পর্যায়ে সহকারী পরিচালক ছিলেন। তৎপরে পার্টির আর্মোরার বিভাগেরও একজন সহকারী ছিলেন। তাঁর ডাক্তারী ও সেলাই কাজে অভিজ্ঞতা ছিল। ততক্ষণে তাঁর স্ত্রী পুত্রকন্যারা তথায় উপস্থিত হওয়াতে পরিস্থিতি আরো ঘণীভূত ও মর্মান্তিক হয়ে উঠে। শুধু ভগবানের নাম ডেকে উচ্চস্বরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন তাঁর অসহায়া পত্নী ও সন্তানেরা। এ হৃদয়ের রক্ত শুকিয়ে যাওয়া কান্নায় সারা সমাধিক্ষেত্র মুহূর্তেই করুণ আর্তনাদে ভরে যায়। এই মর্মভেদী কান্নার মধ্যেই সন্তু স্যার বললেন— "মা বোন ও বাপ ভায়েরা, আপনারা ধৈর্য্য ধরুন বাস্তবতাকে মেনে নেবার চেষ্টা করুন।" মৃদুভাষী, বিনয়ী, একনিষ্ঠ ও সরল মনের অধিকারী শহীদ জুনি মৃত্যুর আগেও প্রয়াত নেতাকে সেবা করে তাঁর স্বদেশ প্রেম, ধৈর্য্য ও সৎ মনোভাবের পরিচয় দিয়ে গেছেন। আমরা আজ এ মুহূর্তে অশ্রুজলে ও মনের কৃতজ্ঞতায় তাঁকে বিদায় দেব।

এই হচ্ছেন চট্টগ্রাম বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি এ অনার্স কোর্সের ছাত্র সৎ, সাহসী ও একনিষ্ঠ সেকেণ্ড লেফ্‌টেন্যান্ট মনিময় দেওয়ান (স্বাগত) যিনি শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে বার বার পার্টিকে শত্রুর অনেক গোপন তথ্য সরবরাহ করেছিলেন। পার্টি তথা গোটা জাতি এ জন্যে অনেক উপকৃত হয়েছিল। তিনি ছিলেন বর্তমান জুম্ম ছাত্র সমাজের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং শান্তি বাহিনীর একজন বীর যোদ্ধা। শত্রুর বিরুদ্ধে ও দুঃসাহসিক কাজে তিনি ছিলেন পারদর্শী ও সুচতুর। শত্রুরা তাঁকে আটক করে নানাভাবে শায়েস্তা করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাঁর প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব ও দুর্জয় মনোভাবের কাছে সে সবই পণ্ড হয়ে গিয়েছিল। তিনি যুব সমিতি ও ছাত্র সমিতির একজন সহকারী পরিচালক ছিলেন। দুঃসাহসী এই তরুণ ঘোরা চক্রান্তকারীদের মারাত্মক আক্রমনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে গিয়ে আজ মরেও অমর হয়ে রইলেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। তাঁর এই মহৎ কৃতিত্ব আমাদের কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

একজন সংগঠক কুশলী কর্মী হিসেবে সুপরিচিত এই সেকেণ্ড লেফ্‌টেন্যান্ট অমর কান্তি চাকমা (মিণ্টু)। তিনি একজন ভদ্র, বিনয়ী, একনিষ্ঠ, শৃঙ্খল দেশপ্রেমিক ছিলেন। তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতার কারণে ২ নম্বর সেকটরের একজন জোন কম্যাণ্ডার হিসেবে আর এম জোনের যাবতীয় বিশৃঙ্খলা ও অটিলতাকে পার্টি অনায়াসে সামলে উঠতে পেরেছিল। মাত্র সপ্তাহ খানেক আগে তিনি খবর পেয়েছেন তাঁর একটি পুত্র সন্তান হয়েছে। তাঁর একমাত্র নবজাত সন্তানের মুখ দর্শনে বঞ্চিত হয়ে তিনি এই চক্রান্তকারীদের গুলিতে শহীদ হলেন। সদ্যপ্রসূতা স্ত্রী তাঁর স্বামীকে হারিয়ে কি নিদারুণ মানসিক যন্ত্রনায় দিন কাটাবেন তা আজ আমাদের ভাষায় ব্যক্ত করার নয়। তাঁর স্ত্রী ও নবজাত শিশুকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছি।

সহীদদের সমাধি

সব চাইতে নীরিহ ও সরল প্রাণের অধিকারী কর্পোরেল অর্জুন ত্রিপুরা। তাঁর একনিষ্ঠতা অধ্যবসায় ও সাহসিকতার কারণে অল্প সময়ের মধ্যে কম্যাণ্ডার হবার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। ঘটনার সময় তিনি বাঘের মতই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন চক্রান্তকারীদের উপর। মৃত্যুর আগে তিনি বিধবা মায়ের জন্য কিছু কাপড় যোগাড় করে রেখেছিলেন। চির দুঃখিনী তাঁর মাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য চিঠি লিখেছিলেন। তিনি একজন সৎ, সাহসী, একনিষ্ঠ যোদ্ধা ছিলেন। তাঁর মাতৃ ভালবাসা ও বীরত্বপূর্ণ সাহসিকতাকে আমরা গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। কম্যাণ্ডার অর্জুনের জীবন প্রদীপ আজ নিভে গেছে বটে কিন্তু তাঁর ত্যাগ, সাহসিকতা আমাদের সংগ্রামের পথে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। করুণ ও বেদনাঘন পরিবেশে সবাই আগুনের কুণ্ডলী হস্তে ধারণ করে দাঁড়িয়েছেন। শ্রদ্ধেয় সন্তু স্যার লীডারের মরদেহের পায়ে মাথা রেখে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করছেন। সকলেরই মন ডুঁকরে ডুঁকরে কাঁদছে; তবু তো দিতে হবে বিদায়। মানুষের ভক্তি, শ্রদ্ধা, মানুষের প্রেমপ্রীতি মায়া মমতা তার সমস্ত হৃদয়ের আকুতি দিয়ে প্রিয়জনদেরকে ধরে রাখতে চায় তবুও তো যায় না রাখা। ... তারপর সবাই চিতায় অগ্নিসংযোগ করতে এলো। হে অগ্নিকুণ্ড! তুমি দ্বিধা হয়োনা। তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে এই বিদেহী পবিত্র আত্মাগুলো তুমি বরণ করে নাও। দেখতে দেখতে আগুনের প্রলয় শিখা ধুম ধুম শব্দে সব কিছুকে গ্রাস করে নিল। আমরা দেখতে পেলাম চির বিদায়ী অবিসংবাদিত নেতার দক্ষিণহস্ত অর্ধচন্দ্রকারে উত্তোলিত হয়েছে যেন আগের মতই তার সবশেষ নির্দেশ আমাদেরকে দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এবার আর সেই অনলবর্ষী ভাষায় নয় শুধু হাতের ইশারায়...। হতভাগ্য জাতির স্বপ্নের একটি দেদীপ্যমান প্রদীপ উজ্জল নক্ষত্র – যে নিজের আলো বিকিরিত করে জাতির তন্দ্রা ভেঙেছে, বেঁচে থাকার বাসনা জাগিয়েছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস দিয়েছে, বাস্তবে তিনি আর নেই। কিন্তু থাকবে তাঁর সেই অমর বাণী, সেই সংগ্রামী সোপান— যে সোপান বেয়ে জাতি তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে।

তারও দুদিন পর। বলিষ্ঠ ও সুঠাম দেহকে বিদীর্ণ করা তিনটা গুলির আঘাতে সীমাহীন যন্ত্রণা ভোগের পর মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে কর্পোরেল সৌমিত্রের জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হয়ে গেল। তিনি ছিলেন সাহসী ও একনিষ্ঠ দেশ প্রেমিক। অপার মাতৃস্নেহে লালিত কম্যাণ্ডার সৌমিত্র ছিলেন মায়ের পুঞ্জিভূত স্নেহের সবকনিষ্ঠ সন্তান। দুর্যোগপূর্ণ দিনগুলোতে তাঁর মায়ের করুণাসিক্ত হৃদয় পুত্র দর্শনের জন্য বড্ডো ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। তাই ঠিক হয়েছিল তিনি নিজে এসে প্রিয়তম সন্তানের মুখ দর্শন করে বিদগ্ধ হৃদয়কে প্রশমিত করবেন; ছেলেকে সোহাগ করে অন্তরের সমস্ত সত্তা দিয়ে আশীর্বাদ করে যাবেন। কিন্তু চক্রান্তের এই বিভীষিকা উত্তপ্ত মাতৃহৃদয়কে করে দিয়েছে আরো, হাহাকার— ফেলে দিয়েছে সীমাহীন শোক সাগরে। মৃত্যুর অন্তিম মুহূর্তে এই অসমদেশ প্রেমিক সন্তান মায়ের কথা তুললো না কারোর জন্য কাঁদলো না, করলো না কোন অভিযোগ। মুমূর্ষু অবস্থায় শুধু বলে গেল — "দেশ প্রেমিক ভায়েরা, তোমরা দমে যেয়োনা, সত্য ও ন্যায় হচ্ছে আমাদের পথ। জয় আমাদের হবেই জয়, জ—য়, জ..."।

১০ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার, একটা বিশ্বাসঘাতকতা, একটা ষড়যন্ত্র, কয়েকটা হাত বোমা ও কয়েক হাজার বুলেটই হলো নির্যাতিত, নিপীড়িত জুম্ম জাতির ইতিহাসের কলংকিত উপকরণ, ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপিত এই চক্রান্তকারীরা পাক-ভারতের মীরজাফর এবং লঙ্কার বিভীষণকেও হার মানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ইতিহাস তার আপন গতি থেকে বিচ্যুত হতে পারেনা। জাতীয় চেতনা কখনও ধ্বংস হতে পারেনা। এই নির্মম ও নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে চক্রান্তকারীরা ভারিক্কী চালে ও দম্ভভরে পদচারণা করেছে, ফুর্তি করে, লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে নিজেদের সাফাই গেয়েছে আবেগ ভরা উন্মাদিকতায়। কিন্তু সবক্ষেত্রই নেতার হত্যার প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে; বিচারের কাঠ-গড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। স্বার্থ ও ক্ষমতার সংঘাতের ফলে ঐ চক্রান্ত-কারীদের কতিপয় নেতা সদলবলে সশস্ত্রভাবে সরকারের কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছে। পার্টির প্রচণ্ড আক্রমণে বিশৃঙ্খল ও হতাশাগ্রস্ত হয়েছে এবং তাদের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। দলীয় কোন্দলে বিশ্বাসঘাতক দেবেনের অপমৃত্যু তাদের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব তাদেরকে ক্ষতবিক্ষত করে চলেছে। সে সময়ে পার্টি উপর্যুপরি প্রচণ্ড আঘাত দিচ্ছে যার ফলে চক্রান্তকারীরা হতাশায় জর্জরিত হয়েছে এবং তাদের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব বেড়ে গিয়েছে। নিজের দলীয় লোকদের হাতে দেবেনের মৃত্যু ঘটনায় তাদের অভ্যন্তরস্থ এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ভয়াবহ রূপ আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। অতপর ষড়যন্ত্রের এই কালো হাত এবং রাজনৈতিক ব্যভিচারিতাকে জুম্ম জনগণের চিনতে আর বাকী থাকেনি। জনগণের ধিক্কার পেয়ে তারা এখন বন্ধ্যা পঙ্গু ও ব্যভিচারের বার্ধক্য অবস্থায়। সেদিন আর বেশী দেরী নেই যেদিন ইতিহাসের আস্তাকুঁড় তাদেরকে স্বাগতম জানাবে।

যে ক্ষমাশীল অগ্রদূত শুধু খাল খনন করে নয় উপরন্তু ঝর্ণা বাঁধিয়ে জল প্রবাহ সৃষ্টি করতে সক্ষম, জাতির সেই কর্ণধারকে চক্রান্তকারীরা বারুদ ভূষণে ভূষিত করতে পারে বটে; কিন্তু গোটা আন্দোলনের মর্যাদা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে না। আভ্যন্তরীণ দুর্বার নদী প্রবাহ বালুকাময় পাড়কে ভাঙতে পারে কিন্তু প্রস্তরীভূত নদীর পাড় সেই ভাঙনকে অবশ্যই রোধ করতে পারে। ১০ই নভেম্বরের শহীদানের পবিত্র রক্ত ধারাকে সাক্ষী রেখে সত্য ও ন্যায়ের পথে সংগ্রামী ইতিহাস আপন গতিতে চলবে আর সেই সাথে শ্রদ্ধাচিত্তে চলবে জুম্ম জাতির করুণ মর্মবেদনাকে বয়ে নেয়া অন্তসলিলা ফল্গুধারা।

জাতীয় উন্মেষ ও আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ভূমিকা

—শ্রীউত্তরন

যুগে যুগে নিপীড়িত, নির্যাতিত ও শোষিত মানুষ স্বাধীকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিপীড়ক ও শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছে। আজও দিকে দিকে সেই সংগ্রাম নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলছে। নিপীড়ন, নির্যাতন, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও শোষনের এক জলন্ত প্রমনি ছয় লক্ষাধিক দশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির আবাসভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের হাতে পদানত হওয়ার পূর্বে স্বাধীন রাজার শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রামে ছিল মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও শোষণ। সমাজে অভিজাত ও প্রজা শ্রেণীই ছিল সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি। অভিজাত শ্রেণীই হলো শাসক আর এই অভিজাত সম্প্রদায় শাসনের নামে প্রজা শ্রেণীর উপর চালাতো অকথ্য নির্যাতন ও নিপীড়ন। অন্যদিকে প্রজা শ্রেণী ছিল উৎপাদনে নিয়োজিত—তাদের না ছিল রাজনৈতিক অধিকার, না ছিল অর্থ নৈতিক অধিকার। কি নির্মম নিপীড়ন ও শোষণ না ছিল। এর পরে শুরু হলো সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের নিপীড়ন, শোষণ ও বঞ্চনার ইতিহাস। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের নিপীড়ন ও শোষণের পর এসেছে ধর্মভিত্তিক ইসলামিক পাকিস্তান ও তার দোসর বাঙ্গালী মুসলমান সম্প্রসারণবাদের নির্মম নিপীড়ন ও শোষণ। আর এখন চলছে বাংলাদেশের উগ্র বাঙ্গালী মুসলমান জাতীয়তাবাদ ও সম্প্রসারণবাদের অবর্ণনীয় নিপীড়ন ও শোষণ। উগ্র বাঙ্গালী অমুসলমান অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলমান অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিণত করার হীন চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের পশ্চাৎপদতা ও রাজনৈতিক সচেতনার অভাবের সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশ সরকার তার সম্প্রসারণবাদী নীতি ছলে-বলে-কৌশলে কার্যকর করতে বদ্ধ পরিকর।

জুম্ম জনগণও আজ ঘুমিয়ে নেই! তারা আজ জেগে উঠেছে। মানুষের মতো মানুষ হয়ে তারা বেঁচে থাকতে একান্ত ইচ্ছুক। জুম্ম জনগণ নিজ নিজ সমাজ, ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে যেতে বদ্ধ পরিকর। এই জন্য জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষনের জন্য অধিকতরভাবে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করতে আজ জুম্ম জনগণ প্রয়াসী হতে চলেছে। যদিও উগ্র বাঙ্গালী মুসলমান জাতীয়তাবাদ ও সম্প্রসারণবাদের সর্বগ্রাসী আক্রমণ ও শোষণে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে।

কেন জাতীয় চেতনা উন্মেষ হয়নি?

বৃটিশ আমলে জাতীয় উন্মেষ না হওয়ার প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে সামন্তবাদী ও উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা। প্রশাসনিক কাঠামো আর অর্থনৈতিক কাঠামো উভয়ই সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের হাতে পদানত হলে বৃটিশ সরকার তার সাম্রাজ্য রক্ষার্থে ও শোষণ অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে পরাজিত অভিজাত শ্রেণীকে হাতে রেখেই পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন নীতি নির্দ্ধারণ করে। শুরু প্রদানে অনিচ্ছুক জুম্ম জনগণের সাথে ১৭৭২ সালে ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক লড়াই হয়। সংঘর্ষে জুম্ম জনগণ জয় লাভ করে। তৎপরে ১৭৭৭ সালে ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পুনরায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়। ইহার পরে ১৭৭৮, ১৭৮০, ১৭৮৪ সালে জুম্ম জনগণের সাথে বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উপর্যুপরি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। শেষ পর্যন্ত ১৭৮৭ সালের যুদ্ধে পরাভূত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের শাসনাধীনে চলে যায় এবং ১৭৮৭ সালে কর প্রদানকারী রাজ্যে পরিণত হয়। ১৭৮৭ সাল থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনে বৃটিশের কোন হস্তক্ষেপ ছিল না। কিন্তু ১৮৬০ সাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের আভ্যন্তরীণ প্রশাসন বৃটিশ সরকারের কর্তৃত্বাধীন হয়। ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রত্যক্ষভাবে সাম্রাজ্য-ভুক্ত করার পর থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনের জন্য বৃটিশ সরকার যে সব আইন প্রবর্ত্তন করেছিল তন্মধ্যে ১৮৯২ সালের "পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনের কতিপয় বিধি" সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপুর্ণ। কেননা এই বিধির উপর ভিত্তি করেই তৎপরবর্ত্তী স্থায়ী শাসন আইন "১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রামের রেগুলেশন" প্রবর্তিত হয়।

স্বাধীনতার যুগে ছিল প্রজা শ্রেণীর উপর অভিজাত শ্রেণীর নির্দয় নিপীড়ন ও শাসন-শোষণ। যার দরুণ জাতীয় অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়েছিল এবং পরবর্তী পর্যায়ে পরাধীনতার যুগে এই নিপীড়ন ও শোষণতো বন্ধ হয়নি বরঞ্চ একদিকে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ আর অপরদিকে অভিজাত শ্রেণী (রাজা, হেডম্যান, কার্বারী, তালুকদার, দেওয়ান, গীসা) নিপীড়ন ও শোষন সমানভাবে চলতে থাকে। ফলতঃ জাতীয় চেতনার উন্মেষ হতে পারেনি। তৎকালীন জাতীয় নেতৃত্বে আসীন অভিজাত শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের লেজুর বৃত্তি করার মনোবৃত্তি আঁকড়ে ধরে থাকার দরুণ জাতি হিসেবে টিকে থাকার ভিত্তি ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়।

"১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন"— এই আইনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামন্তবাদী নেতৃত্ব স্থায়ী করা হলো। রাজা

হেডম্যান, ও কার্বারী এই তিন জনই হলেন জুম্ম জনগণের প্রতিনিধি। এই প্রতিনিধিগণ হচ্ছেন জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতীক। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধির পরিবর্তে বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত প্রতিনিধিত্ব— এই অগণতান্ত্রিক উপনিবেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হলো। ভোটের অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করা হলো। একদিকে বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত প্রতিনিধি রাজা, হেডম্যান কার্বারী আর অন্যদিকে বৃটিশ সরকারের গভর্ণরের প্রতিনিধি ডেপুটি কমিশনার। জনগণ গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হলো। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সামন্তবাদী ও উপনিবেশিক ধ্যান ধারণা শিকড় গেড়ে বসলো। জাতীয়বাদী ও গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ উন্মেষ হতে পারলো না। ফলে জুম্ম জনগণ আপন জাতীয় ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ রয়ে গেলো। জাতীয় চেতনা উন্মেষ না হওয়ায় জাতীয় জাগরণ হলো না। দেশ প্রেম ও জুম্ম জনগণ এভাবেই ঘুনেধরা সামন্তবাদী ও উপনিবেশবাদী সমাজ ব্যবস্থার প্রশাসনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়লো। অথচ একটানা সেই ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের শাসন চললো। এরমধ্যে জাতীয় জীবনে তেমন কোন লক্ষণীয় রাজনৈতিক পরিবর্তন দেখা দিতে পারেনি। এই হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি।

আর পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থার বাস্তব ছবি হচ্ছে সহজ সরল স্বনির্ভর কৃষি ব্যবস্থা। জুম্ম জনগণের মধ্যে ব্যবসায়ী অর্থনীতি অনুপস্থিত। কৃষি ব্যবস্থাও দুই ধরণের সমতল ভূমির চাষ ও জুম চাষ। অর্থনৈতিক জীবনও অতি সরল ও সহজ। জীবন ধারণের দৈনন্দিন জিনিষপত্র মোটামুটি ছিল সহজ প্রাপ্য। প্রকৃতির অঢেল সম্পদ জুম্ম জনগণের সহজ সরল অর্থনৈতিক জীবন গড়ে তুলতে সহায়ক ছিল। তাই দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহে না ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা, না ছিল সংকট, না ছিল পক্ষপাতিত্ব। তাই জুম্ম জনগণ ভারতের রাজনৈতিক গতিধারায় উত্থান-পতনের সাথে সংশ্রবহীন হয়ে পড়ে রইল।

জাতীয় চেতনা উন্মেষ হয়নি বলেই জাতীয় জীবনে সকল প্রকার অন্যায় অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে তেমন প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠতে পারেনি। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠতে না পারলেও কিন্তু পরাধীনতার গ্লানি জাতির বুকে ধিকি ধিকি জ্বলছিল।

বৃটিশ শাসনামলের পর পাকিস্তান শাসনামলেও পৃথক শাসিত অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা প্রদান করা হয়। এবং ব্রিটিশ প্রদত্ত "১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন" নীতিগতভাবে গ্রহণ করে নিয়ে সামন্তবাদী ও উপনিবেশিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা জীইয়ে রাখে। ১৯৫৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে সর্বপ্রথম ভোটের অধিকার প্রদান করা হয় কিন্তু এই ভোটের অধিকার ও সমাজ ব্যবস্থার গোড়ামূলে কোন পরিবর্তন আনতে বা আঘাত দিতে পারেনি। তবে ষাট দশকের প্রারম্ভে বুনিয়াদি গণতন্ত্র (Basic Democracy) সর্বপ্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাজ ব্যবস্থার আঘাত হানে। পার্বত্য চট্টগ্রাম পৃথক শাসিত অঞ্চল হলেও পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে বুনিয়াদি গণতন্ত্র চালু করে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা পাশাপাশিভাবে চালু থাকে। তবে পাকিস্তান সরকার বুনিয়াদি গণতন্ত্রের বিচার বিভাগ পার্বত্য চট্টগ্রামে চালু করতে সক্ষম হয়নি। যেহেতু বিচার বিভাগ রাজা, হেডম্যান ও কার্বারী নিয়ন্ত্রণাধীনে। বুনিয়াদি গণতন্ত্রের উন্নয়ন বিভাগই শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামে চালু করা সম্ভবপর হয়। তবে ইহা উল্লেখযোগ্য যে – এই বুনিয়াদি গণতন্ত্র ও সামন্তবাদী নেতৃত্বের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত বাঁধতে থাকে।

সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থার প্রচণ্ড আঘাত আসে ১৯৬০ সালে যখন কর্ণফুলী কাপ্তাই বহুমুখী জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়। এই বাঁধের ফলে প্রায় এক লক্ষ লোক উদ্বাস্তু হয়। সবচেয়ে উর্বর ও উন্নত এলাকা জলমগ্ন হয়ে যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দু'দিকেই চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। জাতীয় নেতৃত্বে অযোগ্যতা ও স্বার্থপরতার কারণে উপযুক্ত পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ কোনটাই দাবী করা সম্ভব পর হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে মধ্য যুগীয় অর্থনৈতিক অবস্থা বিরাজমান থাকায় পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানো সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। যার ফলে প্রায় প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে চল্লিশ হাজার ও বার্মায় বিশ হাজার জুম্ম সামন্ত আশ্রয়ের সন্ধানে দেশান্তরী হতে বাধ্য হয়। জাতীয় জীবনে এক চরম অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়।

ইহা প্রনিধান যোগ্য যে – পাকিস্তান সরকার বুনিয়াদি গণতন্ত্র ও কাপ্তাই বাঁধ নির্মান করে পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘুনেধরা সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিতে এগিয়ে আসেনি বরং সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থা আরো শক্তভাবে জীইয়ে রাখার জন্য সচেষ্ট ছিল। এই কারণেই পাকিস্তান সরকার বৃটিশ প্রদত্ত "১৯০০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন" সংশোধন করে গণতন্ত্রী করন করেনি, বরাবরই রাজা ও অভিজাত সম্প্রদায়কে প্রাধান্য দিয়েই পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসন ব্যবস্থা চালু রাখে।

জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র :

বৃটিশ সরকার ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে ভারত ও পাকিস্তান— এই দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করে দিয়ে। পাকিস্তান হচ্ছে মুসলমানদের আবাসভূমি। আর ভারত হচ্ছে যারা— জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে থাকতে ইচ্ছুক, তাদের আবাসভূমি। তাই স্বাভাবিকভাবে অমুসলমান অধ্যুষিত Excluded Area পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতেরই অংশ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু

Sir Cyrill Redcliffe [তিনি ছিলেন Bengali Border Award Commission এর চেয়ারম্যান] ন্যায়নীতি সব কিছু বিসর্জন দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম মুসলমানের আবাসভূমি পাকিস্তানের অংশ বলে ঘোষনা দিয়ে যান। আর সেই কারণেই Redcliffe Award এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সে যুগের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ঘনশ্যাম দেওয়ান ও স্নেহ কুমার চাকমার নেতৃত্বে জুম্ম জনগণের দেশ প্রেমিক অংশ ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ সাল রাঙ্গামাটির ডেপুটি কমিশনার এর কার্য্যালয়ে ভারতীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং ২০শে আগষ্ট, ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতের পতাকা উড্ডীন ছিল। কিন্তু স্বৈরাতান্ত্রিক ও উগ্র ধর্মান্ধ পাকিস্তান সরকার অচিরেই বেলুচ রেজিম্যান্ট দিয়ে জোর করে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন ভার দখল করে নেয়। এই ভাবেই Sir Cyrill Redcliffe-এর ঘোষণার মধ্য দিয়ে জুম্ম জনগণের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়লো। ইহা অতীব ক্ষোভ ও লজ্জার বিষয় যে —পার্বত্য চট্টগ্রামের সামন্ততান্ত্রিক জাতীয় নেতৃত্ব এ ঘোষণার কোন প্রতিবাদ না জানিয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে থাকে। মোট জনগণের ৯৯.৪৭% অংশ অমুসলমান অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের করাল গ্রাসে পতিত হলো আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো—জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব অবলুপ্তির ষড়যন্ত্র।

৭ই ডিসেম্বর, ১৮৮১ সালে প্রবর্তিত Chittagong Hill Tracts Frontier Police Regulation (III of 1881) ১৯৭৮ সালেই পাকিস্তান সরকার বাতিল ঘোষণা করে দেয়। পঞ্চাশ দশকের প্রারম্ভেই পার্বত্য চট্টগ্রাম বেআইনী পুনর্বাসন শুরু করে। সর্বপ্রথম সরকার মুসলমান পরিবারের বে-আইনী পুনর্বাসন প্রদান করে সদর মহকুমার নানিয়াচড় ও লংগদু থানা এলাকায় এবং বান্দরবন মহকুমার নাইক্ষ্যংছড়ি ও লামা থানা এলাকায়। পরবর্তীকালে ষাট দশকেই বে-আইনী মুসলমান পুনর্বাসন জোরদার করা হয়। ফলে রামগড় মহকুমার বেলছড়ি, তবলছড়ি, রামগড় মহালছড়ি, গুইমারা প্রভৃতি ইউনিয়নে মুসলমান অনুপ্রবেশকারীর বে-আইনী পুনর্বাসন ও জমি দখল অসম্ভব রকমের বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সর্বোপরি ব্যবসা বাণিজ্যে সমতল-বাসীদেরকে একচেটিয়া অধিকার দিতে থাকে আর পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশাসনে স্থানীয় শিক্ষিত জুম্মদেরকে বঞ্চিত করে সমতলভূমি লোকদেরকে অবাধে নিয়োগ করতে থাকে। এ সবই "১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন" লঙ্ঘন করে পাকিস্তান সরকার কার্যকর করতে থাকে।

একদিকে যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামে মুসলমান পরিবারের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা কার্য্যকরী হতে থাকে ঠিক অন্যদিকে আরেকটি জঘন্য ষড়যন্ত্র কার্য্যকরী হতে থাকে। তাহলো পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত দেশে পরিণত করার নামে কর্ণফুলী নদীর কাপ্তাই হাইড্রোইলেক্ট্রিক প্রজেক্ট বাস্তবায়িত করার পদক্ষেপ নেয়া হলো। আর ১৯৬০ সালেই তা বাস্তবায়িত করা হলো। এই ষড়যন্ত্রই ছিল সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও মারাত্মক। এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত করে একদিকে জাতীয় অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়া হলো আর অপর দিকে জুম্ম জনগণকে এক রকম চিরতরে জন্মভূমিছাড়া করে দেয়া হয়। পাকিস্তান সরকারের যদি জুম্ম জনগণের প্রতি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকতো আর জাতীয় অস্তিত্ব অবলুপ্তির হীন উদ্দেশ্য না থাকতো তাহলে জুম্ম জনগণের মতামত যাচাই করে বাঁধ দেওয়ার চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহন করতো এবং কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ না দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যত্র শঙ্খ নদীতে বাঁধ দিলে তেমন লোক ক্ষতিগ্রস্থ হতো না আর প্রয়োজন মত বিজলীও উৎপাদিত হতে পারতো।

এর পরে আসে সবচেয়ে প্রচণ্ডতম আঘাত। ১৯৬৩ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে উদ্দেশ্যপ্রনোদিত হয়ে সংবিধান সংশোধন করে "পার্বত্য চট্টগ্রাম আর উপজাতি এলাকা নয়"— গৃহীত করে পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক অস্তিত্বের সাংবিধানিক স্বীকৃতি চিরতরে খর্ব করে দেয়া হলো। পার্বত্য চট্টগ্রাম আর পৃথক শাসিত এলাকা নয়—পার্বত্য চট্টগ্রাম এখন থেকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য দশটি এলাকার ন্যায়—এই ঘোষণা জানার পরেও পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘুনেধরা জাতীয় নেতৃত্ব কোন প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন করতে এগিয়ে আসেনি। বলা যায় নীরবে ও নিঃশব্দে এই হীন ও জঘন্য ষড়যন্ত্র মেনে নেয়। যদিও পাকিস্তান সরকার শেষ পর্যন্ত এই সংশোধনী কার্যকর করার সাহস পায়নি।

সর্বোপরি জুম্ম জনগণের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও দারিদ্র্যতার সুযোগে স্থানীয় আমলাদের সহযোগিতা ও ক্ষমতার অপব্যবহারে আর বে-আইনী অনুপ্রবেশকারীদের মূখ্য ভূমিকায় জুম্ম সমাজ জীবনে অনুপ্রবেশ করে নানা প্রকারের দুর্নীতি ও দুরাচার। যার ফলে দ্রুত গতিতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গন কলুষিত হতে থাকে।

এই ভাবে পাকিস্তান শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ধীরে ধীরে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে যেতে থাকে। হাজার হাজার মুসলমান অনুপ্রবেশ, কাপ্তাই বাঁধ, ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন শাসন ও শোষনের নামে অপপ্রয়োগ এবং ১৯৬৩ সালে সংবিধান সংশোধন করে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন বাতিল জুম্ম জনগণকে এক অনিশ্চিত গহ্বরে নিক্ষেপ করে।

সংগ্রামের আহ্বান :

কেন এই ষড়যন্ত্র? এই ষড়যন্ত্র বানচাল করার কি কোন শক্তি নেই?

কেন এই অবলুপ্তি? এর থেকে কি মুক্তি নেই?

সত্যিই এটা এক সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্র শুরু হয় Sir Cyrill Redcliffe এর পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করার ঘোষণার দিন থেকেই। এই ষড়যন্ত্র হচ্ছে একটি দেশের ও সেই দেশের দশ ভাষাভাষী জুম্ম জাতিকে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত করার

ষড়যন্ত্র। হা, সত্যিই অবলুপ্তি। জাতীয় চেতনা উন্মেষ না হওয়াই পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন রাজনৈতিক সংস্থা গড়ে উঠতে পারেনি। গুনেধরা সামন্ত নেতৃত্ব কোন প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেনি। যেহেতু গড়ে তোলারও তার কোন ভিত্তি ছিল না। আধুনিক সভ্যতা সমাজে পরিব্যাপ্ত হলেও জাতীয়তাবাদের ভিত্তি গড়ে উঠেনি। যেটুকু জাতীয় চেতনার উন্মেষ সাধিত হয় তাও সুসংহত অবস্থায় না থাকার কারণে ভারতবর্ষ বিভক্তিকরণ সময়কালীন ও তৎপরে পাকিস্তান সরকার জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র অবাধে কার্যকর করতে থাকে। জাতীয় নেতৃত্ব যেহেতু প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী ও আপোষপন্থী ছিল সেহেতু জুম্ম জনগণের অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এগিয়ে আসেনি। ফলে বরাবরই এই সামন্ত নেতৃত্ব তার তোষণনীতি, ভীরু ও প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র নিয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

সব কিছুরই যেমন পরিবর্তন ও অগ্রগতি রয়েছে, তেমনি জুম্ম জনগণের সমাজ ব্যবস্থাও এক জায়গায় অনড় ও অটল হয়ে থাকেনি। ১৯০০ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক পরিবেশের তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ও অগ্রগতি না হলেও শিক্ষা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার আভিজাত্য বোধের সাথে উদীয়মান জাতীয় চেতনাবোধের সংঘাত বাঁধতে থাকে। আধুনিক সভ্যতা ও শাসন ব্যবস্থার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা প্রত্যক্ষ করবার মতো জাতীয় চেতনার উন্মেষ ধীরে ধীরে জুম্ম জনগণের মধ্যে বিশেষতঃ শিক্ষিত সমাজের মধ্যে হতে থাকে।

উদীয়মান জাতীয় চেতনার প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯০৫ সালে রাজমোহন দেওয়ানের নেতৃত্বে গঠিত "চাকমা যুবক সমিতি" প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এই চাকমা যুবক সমিতির নেতৃত্বে শুধু অভিজাত পরিবারের সন্তান নয় প্রজা পরিবারের সন্তানও ছিল। এই সমিতির উদ্দেশ্যে ও কার্যক্রম শুধুমাত্র শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির উন্নয়নকল্পে গঠিত হলেও জাতীয় জাগরণের বীজ এই সমিতির মধ্যে উপ্ত হয়ে থাকে। কেননা পরবর্তীকালে এই সমিতির কতিপয় নেতৃবৃন্দ বিশ ও ত্রিশ দশকে জাতীয় চেতনার উন্মেষের বীজ প্রস্ফুটিত করতে সমর্থন হন। তন্মধ্যে বিশিষ্ট সমাজসেবী শিক্ষা বিস্তারের অগ্রদূত ও ঘুঁনে ধরা সামন্ত নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একমাত্র প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর কৃষ্ণ কিশোর চাকমার অবদান সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

১৯২৮ সালে ঘনশ্যাম দেওয়ানের নেতৃত্বে 'চাকমা যুবক সংঘ" গঠিত হয়। এই সংঘের কার্যকাল অল্প হলেও জুম্ম জাতির জাতীয় চেতনা উন্মেষের ক্ষেত্রে একটা মাইল-স্টোন হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। সর্বোপরি কামিনী মোহন দেওয়ানের নেতৃত্বে ১৯২০ সালে "পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতি" নামে আরেকটি অরাজনৈতিক সংগঠন এই সময়ে গঠিত হয়। এই জন সমিতি মূলতঃ হেডম্যানদের স্বার্থই সংরক্ষণ করতো। এছাড়া রাজন্যবর্গ ও অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে Hillman Association নামে অভিজাত শ্রেণীর নেতৃত্বে ভারত বিভক্তির সময়কালীনও একটা সংগঠন গড়ে উঠে।

ব্রিটিশ শাসনামলে জাতীয় চেতনাবোধ উন্মেষ হতে না পারায় কোনও রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠতে পারেনি। ফলে জুম্ম জাতির স্বার্থ সংরক্ষণে ব্রিটিশ সরকার কোন সুব্যবস্থা তো করে দেয়নি বরং কোন এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে জড়িত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়ে জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব বিলুপ্তির পথ উন্মুক্ত করে দিয়ে যায়।

অনেক দেরীতে হলেও জুম্ম জনগণের মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘনীভূত হতে শুরু করে পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময়কাল থেকে। উগ্র ধর্মান্ধ ও স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকারের নিপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম ছাত্র সমাজ অনন্ত বিহারী খীসার ও সুধাকর খীসার নেতৃত্বে ১৯৫৬ সালে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং তৎপরবর্তী বিশেষতঃ ১৯৮০ সাল থেকে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে পাহাড়ী ছাত্র সমিতি ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে। পৃথিবী জুড়ে যখন নিপীড়িত, নির্যাতিত ও শোষিত মানুষ অত্যাচার ও শোষণের নাগপাশ ছিন্ন করে মুক্ত হওয়ার জন্য দুর্বার গতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে তখন পার্বত্য চট্টগ্রামের সচেতন শিক্ষিত সমাজ নিজেদেরকে অদৃষ্টের উপর ঠেলে দিয়ে পাকিস্তান সরকারের সর্বপ্রকারের নির্যাতন, নিপীড়ন ও শোষণ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, অনন্ত বিহারী খীসা, সন্তু লারমা, অমিয় সেন চাকমা, জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, মংসাথু চৌধুরী, বীরকুমার চাকমা, রূপায়ণ দেওয়ান, স্নেহময় চাকমা, মংচাবাই মারমা, প্রশান্ত কুমার চাকমা, গৌতম কুমার চাকমা, ঈষাতন তালুকদার প্রমুখ মুখ বুজে সহ্য করতে রাজী নয়। তাই ষাট দশকের প্রারম্ভ থেকেই গোপনে গোপনে রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু হতে থাকে। শাসনতান্ত্রিক বাধা নিষেধের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রকাশ্য রাজনীতি করার অধিকার নেই। তবুও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সচেতন বুদ্ধিজীবি ও ছাত্র সমাজ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ উন্নয়নের কার্যকলাপের আড়ালে ব্যাপক জুম্ম জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদান করে অধিকার সচেতন করে তুলতে থাকে। এই সময়ে "পার্বত্য চট্টগ্রাম শিক্ষক সমিতি" সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল ও সুদূর প্রসারী ভূমিকা পালন করে থাকে।

১৯৬৬ সাল পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জাতীয় চেতনা উন্মেষ ও জাগরণের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরেই ডিসেম্বর মাসে অনন্ত বিহারী খীসা ও সন্তু লারমার নেতৃত্বে গঠিত হয় "পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয় কল্যাণ পরিষদ" The Chittagong Hill Tracts Tribal Welfare Association)। এই পরিষদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল জুম্ম জনগণের মধ্যে একটা প্রগতিশীল জাতীয়

নেতৃত্ব গড়ে তোলা। এইভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয় কল্যাণ পরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র সমিতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম শিক্ষক সমিতি সম্মিলিতভাবে জুম্ম সমাজ ও সংস্কৃতি উন্নয়নের কার্যক্রমের পাশাপাশি রাজনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় জাগরণ আনয়ন ও নেতৃত্ব গঠনে অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে থাকে। জুম্ম জনগণ অধিকার সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। এবং যুগোপযোগী শাসন-ব্যবস্থা পাবার আশায় ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। জনগণ উপলব্ধি করতে থাকে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ সংগ্রাম ছাড়া যেমনি যুনেধরা সামন্ত নেতৃত্ব পরিবর্তন করা যাবেনা তেমনি জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভবপর হবেনা। এভাবেই যাট দশকের শেষ প্রান্তে আর সত্তর দশকের প্রারম্ভেই জুম্ম জনগণের সচেতনতা ও ঐক্য শক্তি প্রত্যক্ষ করার মত হয়ে উঠে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে এই অধিকার সচেতনতা ও ঐক্য শক্তির প্রতিফলন ঘটে। এই নির্বাচনে "পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয় কল্যাণ পরিষদ" এর নেতৃত্বে প্রগতিশীল সচেতন শিক্ষিত সমাজ "নির্বাচন পরিচালনা কমিটি" নাম দিয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। নির্বাচনী ঘোষণা পত্রে মোট ষোলটি দাবী উত্থাপন করা হয়। তন্মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের প্রাণের দাবী "নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত স্বায়ত্ত শাসনের দাবী উত্থাপন করা হয়। নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত স্বায়ত্ত শাসন আদায়ের সংগ্রামে সামিল হতে জুম্ম জনগণকে আহ্বান দেয়া হলো। জুম্ম জনগণও স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বাচনী পরিচালনা কমিটির পক্ষে ভোট প্রদান করে পার্বত্য চট্টগ্রামের নূতন নেতৃত্বকে সাদরে বরণ করে নেয়।

একদিকে জুম্ম জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও সংগ্রামী করার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হতে লাগলো, অপরদিকে প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী ও আপোষপন্থী সামন্ত নেতৃত্বের পরিবর্তনের জন্য নব্য চিন্তা ও চেতনা তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে চললো। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মাধ্যমে শুরু হলো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

ন্যায্য অধিকার জুম্ম জনগণ পেতে চায়। ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়োজন জাতীয় নেতৃত্ব। আজ সেই জাতীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। '১৯৭০ সালের আহ্বান ও জাগরণ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রামে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ সংগ্রামরূপে জাতির ইতিহাসে অভ্যুদয় ঘটে।

জনসংহতি সমিতির জন্ম এবং জুম্ম জনগণ ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব সংঘাতঃ

এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জন্ম হয়। পাকিস্তানের অংশ পূর্ব পাকিস্তানই বাংলাদেশ নামে অভিহিত হয়। উত্তরাধিকারী সূত্রে বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের কর্তৃত্ব লাভ করে এবং এই কর্তৃত্ব পাবার পর পরই বাঙ্গালী মুসলমান সরকার পাকিস্তানের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে উঠে পড়ে লেগে যায়। পাকিস্তান সরকারের মত বাংলাদেশ সরকারও হীন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। অথচ বাংলাদেশ সৃষ্টির পর জুম্ম জনগণ আশা করেছিল যে এবার তারা রাজনৈতিক নিপীড়ন ও অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু বাস্তবে ঠিক তার বিপরীতটাই ঘটতে লাগলো। পাকিস্তান শাসনামলে জুম্ম জনগণকে ভারতপন্থী, ভারতের দালাল বলে আখ্যায়িত করা হয় আর যেই না বাংলাদেশ সৃষ্টি হলো তখন রাতারাতি জুম্ম জনগণকে পাকিস্তানপন্থী বলে চিহ্নিত করা হতে লাগলো। অথচ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে জুম্ম জনগণেরও যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তা সত্ত্বেও উগ্র বাঙ্গালী মুসলমান জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী জুম্ম জনগণকে জন্মভূমি থেকে উৎখাত করার হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো।

বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে শুরু হলো একদিকে অবর্ণনীয় অমানুষিক অত্যাচার ও উৎপীড়ন আর অপরদিকে জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র। পাক সেনাদের অত্যাচার উৎপীড়নের ক্ষত শুকোতে না শুকোতেই জুম্ম জনগণের উপর নেমে আসলো ঘোর অমানিশা। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশের আর্মি, বি ডি আর, পুলিশ বাহিনী মুক্তিবাহিনী ক্ষেপা কুকুরের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো জুম্ম নর-নারীর উপর। শুরু হলো পার্বত্য চট্টগ্রামব্যাপী পাশবিক অত্যাচার ও উৎপীড়ন—আবালবৃদ্ধবনিতাকে নির্বিশেষে হত্যা, ধর্ষন, লুঠপাট, মারপিট, গ্রেপ্তার, জেল-জুলুম, ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয়া ও বিভিন্ন প্রকারের নিপীড়ন ও নির্যাতনমূলক হীন কার্যকলাপ, রাজাকার মুজাহিদ ও মিজো (MIZO NATIONAL FRONT) দমনের নামে বিভিন্ন অঞ্চলে নিরীহ ও নিরপরাধী জনগণের উপর চলতে লাগলো দমনমূলক সন্ত্রাসী কার্যকলাপ। সেই সাথে চললো বে-আইনী অনুপ্রবেশ, বেআইনী জমি বন্দোবস্তী ও জমি দখলের প্রতিযোগিতা, ব্যবসা-বাণিজ্যে বহিরাগতদেরকে একচেটিয়া অধিকার প্রদান ও স্থানীয় প্রশাসনে বহিরাগতদের একচেটিয়া নিযুক্তি। অপরদিকে শত শত নিরপরাধ জুম্মকে নানা প্রকারের সাজা দেওয়া হতে লাগলো। ধরপাকড়, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, ডাকাতি, রাহাজানি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে পড়ে। শত শত লোকের বিরুদ্ধে হুলিয়া বা ওয়ারেন্ট জারী করা হলো। সরকারী প্রশাসনযন্ত্র ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের ষড়যন্ত্রে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হতে থাকে। খাদ্যাভাব দেখা দিল, চাষাবাদ বন্ধ হলো, বন্ধ হলো স্কুল কলেজ, শত শত পরিবার বনে জঙ্গলে পালিয়ে পালিয়ে এক অসহনীয় ও অস্বাভাবিক জীবন যাপনে বাধ্য হলো। এমনি সময়ে বাংলাদেশ সরকার এক হীন ষড়যন্ত্র করে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলো। এই ঘোষণার সাথে সাথে আত্মগোপনে অবস্থানরত অনেক নিরপরাধী ব্যক্তি সহ রাজাকার, মুজাহিদ আত্মসমর্পণ করলো। কিন্তু কি অবস্থা! বাংলাদেশ সরকার এই আত্মসমর্পিত--

দেরকে গুলি করে হত্যা করলো। শেষ পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলে পুনরায় সন্ত্রাস ও ভীতির রাজত্ব দেখা দিল। কেউ আর সরকারের ঘোষণায় এগিয়ে আসতে সাহস করলো না। বাংলাদেশ সরকার ও জুম্ম জনগনের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলো। উভয়ের মধ্যে দানা বেঁধে উঠলো সন্দেহ, অবিশ্বাস ও প্রতিহিংসা।

এবদিকে আওয়ামী-লীগ সরকার ও তার সহযোগীদের অত্যাচার উৎপীড়ন আর অপরদিকে দুস্কৃতিকারীদের দৌরাত্ম্যে জুম্ম জনগণের জীবন যাত্রা দুর্বিসহ হয়ে উঠলো। জনগণ সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়ালো। সমগ্র অঞ্চলে এক অচলাবস্থা দেখা দিল। জুম্ম জনগণ ঠিক এমনি সময়ে একটি রাজনৈতিক দলের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করতে লাগলো।

জাতীয় জীবনের এই দুর্যোগপূর্ণ দিনে ১৯৭০ সালে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম নির্বাচন পরিচালনা কমিটির নেতৃত্ব জুম্ম জনগণের পাশে এসে দাঁড়ালো ও দৃঢ়তার সাথে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করে যেতে লাগলো। সেই সাথে একটা পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক দল গঠন করার কার্যক্রমও এগিয়ে চল্লো। এইভাবে ১৯৭২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে "পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি" জন্মলাভ করলো। পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতীয় জাগরণ ও স্বাধীকার আন্দোলনের ইতিহাসে এই দিনটি চিরস্মরনীয় হয়ে রইল। কেননা আজকের দিনেই পার্বত্য চট্টগ্রামে সর্বপ্রথম গঠিত হলো জাতীয় পর্যায়ের একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন।

জন সংহতি সমিতির করণীয় কর্তব্য ও শান্তি বাহিনীর জন্ম :

জন সংহতি সমিতি জন্মের সাথে সাথে ঘোষনা করে যে পার্বত্য চট্টগ্রাম দশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভিন্ন ভাষা-ভাষী জাতির আবাসভূমি।

সুতরাং— (১) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভিন্ন ভাষা-ভাষী জাতিসমূহের নিজস্ব মধ্যে ভেদাভেদ, নিপীড়ন, বঞ্চনা ও শোষণ বন্ধ করা :

(২) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভিন্ন ভাষাভাষী জাতি সমূহের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করা এবং

(৩) পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

—এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়নের সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভিত্তিতে জুম্ম জনগণের নিকট জনসংহতি সমিতি তার সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী তুলে ধরে জন্মভূমি ও জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও বিকাশের উদাত্ত আহ্বান রাখে। যুগ যুগান্তরের পরাধীনতা নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য জাতির একমাত্র জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সংগ্রামী আহ্বান পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিটি নরনারীর নিকট ধ্বনিত হয়। পার্টির এই বিপ্লবী আহ্বানে সমগ্র জুম্ম জনতা দলীয় কর্মসূচী গ্রহণ করে নেয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হলো।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শুরু হলো বিরাজমান পরিস্থিতি পরিবর্তন ও দাবী দাওয়া পূরণের আন্দোলন। কিন্তু উগ্র বাঙ্গালী মুসলমান জাতীয়তাবাদী ও সম্প্রসারণবাদী বাংলাদেশ সরকার জুম্ম জনগণের সকল আবেদন নিবেদন ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করলো। আর সকল ক্ষেত্রে অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ করে যেতে লাগলো। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত জনসংহতি সমিতির সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো বাংলাদেশ সরকারের অনমনীয় মনোভাব হীন কার্যকলাপ জুম্ম জাতির অবলুপ্তির পথ ত্বরান্বিত করতে লাগলো। এতে শেষ পর্যন্ত জুম্ম জনগণকে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে আত্মরক্ষার তাগিদে এবং জন্মভূমির অস্তিত্ব ও জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ বেছে নিতে বাধ্য করা হলো। তাই ১৯৭৩ সালে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে গড়ে উঠলো জনসংহতি সমিতির সামরিক অঙ্গ সংগঠন "শান্তি বাহিনী" যা জুম্ম জনগণের একমাত্র সশস্ত্র বাহিনী।

শত্রুর সন্ধানে শান্তিবাহিনী

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক যুগ ধরে অনেক উত্থান-পতন হয়ে গেলো। কিন্তু জুম্ম জনগণের ভাগ্যাকাশে কালো মেঘ অপসারিত হলো না। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধান জুম্ম জনগণকে কি দিয়েছে? ১৯৭২ সালের সংবিধান দিয়েছে--

(১) পার্বত্য চট্টগ্রাম আর পৃথক শাসিত অঞ্চল হিসেবে শাসিত হবে না;

(২) পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতি বাংলাদেশের বাঙ্গালী মুসলমান জাতি হিসেবে পরিচিত হবে।

পাকিস্তান সরকার যা চেয়েছিল করতে আর করতে গিয়ে যা সমাপ্ত করতে পারেনি, বাংলাদেশ সরকার পাকিস্তান সরকারের ন্যায় তা করতে ইচ্ছুক ও পাকিস্তান সরকারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে দিতে বদ্ধ পরিকর। তাই বেআইনী বাঙ্গালী মুসলমান অনুপ্রবেশ করণ ও পুনর্বাসন প্রদান, বেআইনী বন্দোবস্তী ও জমি দখল, জুম্ম গ্রাম ধ্বংস করন অভিযান, পার্বত্য চট্টগ্রাম তিনটি জেলায় খণ্ডিতকরণ, অর্থনৈতিক অবরোধ ও কৃত্রিম অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি, যুক্তগ্রাম ও আদর্শ গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে কারাগারে জীবন যাপনে বাধ্য করানো, সর্বোপরি পরিকল্পিত সামরিক অভিযানের মাধ্যমে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে এক বিভীষিকাময় অবস্থা সৃষ্টি করে চলেছে। এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সরকার অমুসলমান অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলমান অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিণত করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে চলেছে।

জুম্ম জনগণ চায় প্রতিষ্ঠা আর বাংলাদেশ সরকার চায় অবলুপ্তি। জুম্ম জনগণ নিপীড়ন, বঞ্চনা ও শোষণ থেকে মুক্তি লাভ করতে প্রয়াসী। তাই বাংলাদেশ সরকার ও জুম্ম জনগণের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে তীব্র দ্বন্দ্ব সংঘাত বেঁধে উঠেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ বিচ্ছিন্নতাবাদী নয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে বিশ্বাসী নয়। সরল ও সহজ জীবনের অধিকারী শান্তি প্রিয় পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনতা বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলের জনগণের সাথে সমতলে পা ফেলে দেশমাতৃকার সেবা করতে দৃঢ় সংকল্প কিন্তু ঐতিহাসিক কারণে আজ জুম্ম জনগণ সেবা করার সেই মহান দায়িত্ব ও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত।

জুম্ম জনগণ আজ ঐক্যবদ্ধ। জন সংহতি সমিতিই জুম্ম জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। জন সংহতি সমিতি জুম্ম জাতির জাতীয় চেতনার উন্মেষ সাধন করেছে। সুতরাং জাতীয় অস্তিত্বও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও বিকাশের সংগ্রামে জনসংহতি সমিতি তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করে চলেছেই।

সংগ্রামের রূপ হচ্ছে জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও বিকাশ সাধন। জুম্ম জনগণের দেশপ্রেমিক অংশ এই সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান করে চলেছে। প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী আপোষপন্থী, ক্ষমতালোভী ও বিভেদপন্থীরা জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রামে পার্শ্ব থেকে ছুরিকাঘাত করলে ও এই আন্দোলন থেমে যেতে পারেনা। অথবা কাণ্ডারী বিহীন হবে না। কেননা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সংগ্রামে কঠিনতম দিনগুলোতেও জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব বিভ্রান্ত ও বিকলিত না হয়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছে। যে কোন প্রকারের ষড়যন্ত্র জনসংহতি সমিতি স্তব্ধ করে দিতে সদা প্রস্তুত।

জনসংহতি সমিতি জুম্ম জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতীক। এই সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রামে পুরোধায় রয়েছে তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের জন্য। পার্বত্য চট্টগ্রামের নিপীড়িত ও শোষিত জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত জনসংহতি সমিতি তার সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর বাস্তবায়ণের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত এগিয়ে যাবেই।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সংক্ষিপ্ত জীবনী

—শ্রীহিমাদ্রী

ক্ষমা গুণ, শিক্ষা গ্রহণের গুণ, পরিবর্তিত হওয়ার গুণ— এই তিন গুণের অধিকারী না হলে প্রকৃত বিপ্লবী হওয়া যায়না।

— এম, এন, লারমা

রাংগামাটি শহরের অনতিদূরে মহাপুরম একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামের মধ্য দিয়েই ছোটনদী মহাপুরম প্রবাহিত। কিন্তু আজ সেই কর্মব্যস্ত বর্ধিষ্ণু গ্রাম মহাপুরম কাপ্তাই হ্রদের অথৈই জলে বিলীন হয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে তার স্মৃতি ও গৌরব। এই মহাপুরম গ্রামেই জুম্ম জাতির জাগরণের অগ্রদূত, মহান দেশপ্রেমিক নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের ঘনিষ্ট বিপ্লবী বন্ধু, কঠোর সংগ্রামী, ক্ষমাশীল, চিন্তাবিদ, জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা (মঞ্জু) ১৯৩৯ সালে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শ্রীচিত্ত কিশোর চাকমা সেই গ্রামেরই জুনিয়র হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি একজন শিক্ষাবিদ, ধার্মিক ও সমাজসেবী। স্নেহময়ী মাতা পরলোকগতা শুভাষিনী দেওয়ানও একজন ধর্মপ্রাণা সমাজ হিতৈষীনি ছিলেন। এম, এন, লারমার দুই ভাই ও এক বোন। ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধের ফলে জন্ম স্থানের বাস্তুভিটা জলে মগ্ন হলে পানছড়িতে নব বসতি স্থাপন করেন। এম, এন, লারমা মাতা-পিতার তৃতীয় সন্তান। তাঁর একমাত্র বোন জ্যোতিপ্রভা লারমা (মিনু) সবার বড়। তিনিও বেশ শিক্ষিত। বড় ভাই শুভেন্দু প্রবাস লারমা (বুলু) ১০ই নভেম্বরের মর্মান্তিক ঘটনায় শহীদ হন। শহীদ শুভেন্দু লারমা রাজনৈতিক জীবনে একজন সক্রিয় সংগঠক, বিপ্লবী ও একনিষ্ঠ সমাজ সেবক ছিলেন। ছোট ভাই জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু)। তিনি পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। তিনি হচ্ছেন একজন বিপ্লবী নেতা, সংগঠক সমাজ সেবক, নিপীড়িত জাতি ও জুম্ম জনগণের একনিষ্ঠ বিপ্লবী বন্ধু; মহান দেশপ্রেমিক ও কঠোর সংগ্রামী। তিনি জনসংহতি সমিতির একজন নেতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। শান্তি বাহিনী গঠনে তাঁর অবদান ও ভূমিকা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ১০ই নভেম্বর, ১৯৮৩ সালের মর্মান্তিক ঘটনায় এম, এন, লারমা শহীদ হওয়ার পর তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতির পদে নির্বাচিত হন। তিনি এম, এ, পাশ।

এম, এন, লারমা যৌবনকালে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। বিপ্লবী জীবনের কঠোর পরিশ্রমের ফলে পরবর্তীকালে তাঁর স্বাস্থ্য কিছুটা ভেঙ্গে পড়ে। তাঁর কথাবার্তা মৃদু, কণ্ঠস্বর গম্ভীর, আচার ব্যবহার অমায়িক, ভদ্র ও নম্র। তিনি সৎ, নিষ্ঠাবান ও সুশৃঙ্খল ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি খুবই সাদাসিধাভাবে জীবন যাপন করতেন। তাঁর স্মরণশক্তি ছিল তীক্ষ্ণ। তিনি সৃজনশীল মেধার অধিকারী ছিলেন। কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। অসীম ধৈর্য্য, সাহস, মনোবল, আত্মবিশ্বাস ও কষ্টসহিষ্ণুতার অধিকারী ছিলেন। এ সমস্ত গুনাবলী অর্জনে তিনি তাঁর পিতা-মাতার প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

এবার কর্মজীবনের পরিচয়ে আসা যাক। ১৯৬৬ সালে তিনি দিঘীনালা উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে চাকুরীতে যোগদান করেন। এরপর তিনি ১৯৬৮ সালে চট্টগ্রামে এক প্রাইভেট বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। তাঁর সুদক্ষ কর্মকৌশলের ফলে ঐ বিদ্যালয়টি উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করন। একজন শিক্ষক হিসাবে তিনি যথেষ্ট সুনাম ও খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর পাঠদানের পদ্ধতি ছিল খুবই আকর্ষনীয়। অতি সহজে তিনি কঠিনতম বিষয়বস্তু সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিতে পারতেন। শিক্ষকতার জীবনে তিনি ছাত্র সমাজকে দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস পেতেন।

তিনি ১৯৫৮ সালে রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় হতে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এর পর তিনি চট্টগ্রাম সরকারী মহাবিদ্যালয়ে আই, এ, ভর্ত্তি হন এবং ১৯১০ সালে আই, এ, পাশ করেন। আই এপাশ করার পর একই কলেজে বি, এতে ভর্ত্তি হন। তখন অধ্যায়নরত অবস্থায় রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত করে পাকিস্থান সরকার তাঁকে নিরাপত্তা আইনের অধীনে ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩ সালে গ্রেপ্তার করেন এবং প্রায় দীর্ঘ দুই বৎসরের অধিক কারাবরণ করার পর শর্ত সাপেক্ষে ৮ই মার্চ ১৯৬৫ সালে মুক্তি পান। সমাজ কল্যাণ বিভাগের অধীনে থেকে একই বৎসরে বি, এ, পাশ করেন। ১৯৬৮ সালে বি, এড পাশ করেন ও ১৯৬৯ সালে এল, এল, বি পাশ করে একজন আইন-জীবি হিসেবে তিনি চট্টগ্রাম বার এসোসিয়েশনে যোগদান করেন। ১৯৭৪ সালে চারু বিকাশ চাকমা বাংলাদেশ সরকারের হাতে গ্রেপ্তার

হলে ঐ মামলার আইনজীবি হিসেবে যথেষ্ট দক্ষতা ও মহানুভবতার পরিচয় দেন।

১৯৭০ সালে পাকিস্থানে প্রদেশিক পরিষদে পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তরাঞ্চল হতে আওয়ামী লীগ প্রার্থী সহ সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তারপরে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। বাংলাদেশ গণপরিষদে সদস্য থাকার সময়ে সরকারী প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ১৯৭৪ সালে লণ্ডনে যান।

এবার আসা যাক্ রাজনৈতিক জীবনের পরিচয়ে। শ্রদ্ধেয় নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জীবনটা'ই হচ্ছে আগাগোড়া রাজনৈতিক মহান কর্মকাণ্ডে বিজড়িত। তিনি পরিবারের পরিবেশ থেকেই রাজনীতির হাতেখড়ি নেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি অধিকার হারা জুম্ম জনগণের মর্মবেদনা অনুভব করতে পেরেছিলেন। প্রজা শ্রেণী যখন অভিজাত শ্রেণীর নিপীড়ন নির্যাতনে ও শোষণের আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা ছিল তখন নেতার পিতামহ এই সব নির্যাতন নিপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে সেই যুগে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ছিলেন। তাঁর পিতাও একজন প্রগতিবাদী হিসেবে সামন্ত শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে আজীবন একজন সংগ্রামী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। সর্বোপরি তাঁর জেঠা কৃষ্ণ কিশোর চাকমা যিনি মহান শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী হিসাবে সর্বপ্রথম জুম্ম জনগণের মধ্যে শিক্ষার আলো দিয়ে জাতীয় চেতনা উন্মেষ সাধনে ব্রতী ছিলেন। সেই মহান ব্যক্তি থেকেও তিনি রাজনীতির অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন।

মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা ছাত্র জীবন থেকেই রাজনীতিতে জড়িত হয়ে পড়েন। তিনি ছাত্র জীবন থেকেই স্বীয় সমাজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন। রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সময় একদিন জনৈক শিক্ষক মহোদয় ইসলামিক ইতিহাসের উপর পাঠদানের সময় জুম্ম জাতির জাতীয় ইতিহাসের সম্পর্কে পক্ষপাত দুষ্ট কথা বললে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়িয়ে শিক্ষক মহোদয়ের উক্তির প্রতিবাদ করেন। এবং শেষ পর্যন্ত মাননীয় শিক্ষক তা সংশোধন করে নিতে বাধ্য হন। এইভাবে তিনি ছাত্র জীবন থেকে স্বকীয় জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সংগ্রামী মুখর ছিলেন।

১৯৫৬ সালেই তিনি সর্বপ্রথম জুম্ম ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেন। ১৯৫৭ সালের পাহাড়ী ছাত্র সম্মেলনে তিনি এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে থাকেন। তিনি তখন থেকেই সকল অনাচার অবিচারের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে উঠতে থাকেন। নিম্নোক্ত ঘটনার মাধ্যমে তাঁর পূর্ণ স্বাক্ষর মেলে। তিনি তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী। বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের মাননীয় সুপার ছাত্রাবাসের পরীক্ষার্থীদেরকে সুবিধামত ভাবে আহারের সময় নির্দ্ধারণ করে দিতে অনুমতি প্রদান না করলে পরীক্ষার্থীরা তারই নেতৃত্বে অনশন ধর্মঘট করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ অনুমতি প্রদানে বাধ্য হন।

কলেজ জীবনে তিনি রাজনীতির বৃহত্তর চত্বরে প্রবেশ করেন। এই সময়ে তিনি আগের চেয়ে আরো অধিক পরিমানে জাতিগত শোষণ ও নিপীড়ন প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। ১৯৬০ সাল জুম্ম জাতির ভাগ্যাকাশে এক কালো মেঘ। কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের বাস্তবায়নে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব বিলুপ্ত করণে উগ্র ধর্মান্ধ পাকিস্থান সরকারের এই হীন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করলে তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ১৯৬০ সাল থেকে পাহাড়ী ছাত্র সমাজের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন। ১৯৬২ সালের ঐতিহাসিক পাহাড়ী ছাত্র সম্মেলন তাঁরই নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করার পর তিনি গ্রামে ফিরে আসলেন এবং একদিকে জুম্ম জনগণকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন আর অপরদিকে পাহাড়ী ছাত্র সমাজকে একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করার এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে থাকেন। অপরদিকে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্থানের বৃহত্তর রাজনৈতিক অঙ্গনেও পদচারনা করতে থাকেন। আর স্বজাতিকে কিভাবে রাজনৈতিক নিপীড়ন ও অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্ত করা যায় তার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকেন। এইভাবে ষষ্ঠ দশক পর্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ ভাবে জুম্ম জনগণকে রাজনৈতিক ভাবে ঐক্যবদ্ধ ও সচেতন করার কার্যে নিয়োজিত থাকেন।

প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত সমাজ যখন পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম সমাজকে অক্টোপাশের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে সামনে অগ্রসর হতে দিচ্ছিলো না, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতি যখন আপন জাতীয় সত্তা ও বৈশিষ্ট্য হারাতে বসলো ; উগ্র ইসলামিক ধর্মান্ধ স্বৈরাচারী পাকিস্থান সরকার যখন জুম্ম জাতিকে ধ্বংস করার জন্য একটার পর একটা হীন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলো ; ঠিক সেই সময়ে রাজনীতিক অঙ্গনে পাকাপোক্ত ভাবে ১৯৭০ সালে আবির্ভূত হলেন এম, এন, লারমা বিশ্বের সবচেয়ে প্রগতিশীল চিন্তাধারা মানবতাবাদ নিয়ে লুপ্ত প্রায় জুম্ম জাতির রক্ষা কবচ হিসাবে।

বিলুপ্ত প্রায় জুম্ম জাতির ভাগ্যাকাশে দেখা দিল একটি উজ্জল নক্ষত্র। দেখতে পেল জাগ্রত ঘুমন্ত শিশুর চোখে আধুনিক জগতের সভ্যতার আলোক দিশা। চিনতে লাগলো নিজ জাতীয় সত্তাকে। খুঁজতে লাগলো আপন জাতীয় সত্তা ও বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করার মুক্তির পথ। ঠিক এমনি সময়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে শুরু হলো মুক্তি যুদ্ধ। এই মুক্তি যুদ্ধে এম, এন, লারমা তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করতে থাকেন। কিন্তু উগ্র বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র সু-কৌশলে তাঁকে মুক্তি যুদ্ধ থেকে দূরে

সরিয়ে রাখে। ১৯৭১ সালে, ১৬ই ডিসেম্বরে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে জন্মলাভ করলো কিন্তু জুম্ম জনগণের ভাগ্য পরিবর্তিত হলো না। শুরু হলো উগ্র বাঙ্গালী মুসলমান জাতীয়তাবাদের নির্মম শোষণ ও নিপীড়ন। মুক্তি বাহিনী ও সরকারী বাহিনীর অত্যাচার আর নির্যাতনে ক্ষত বিক্ষত হলো অক্ষম ও দুর্বল জনগণ। বহু ঘরবাড়ী পুড়ে ছাই করে দিল; শত শত মা বোনের ইজ্জত নষ্ট করে দিল; রাইফেলের গুলিতে হত্যা করলো শত শত লোককে। কত অশ্রু ঝরলো চোখে, কত রক্ত ঝরলো বুকে। হায়রে, হতভাগ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম।

এইভাবে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে যখন অগ্নি সংযোগ নারী ধর্ষণ, হত্যা, ডাকাতি, লুঠতরাজ ও সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছিল তখন জুম্ম জাতি রক্ষা করার জন্য তাঁর নেতৃত্বে এগিয়ে আসলেন শিক্ষিত, প্রগতিশীল ও সচেতন জুম্ম সমাজ। দেশ, সমাজ ও দেশ রক্ষার ডাক দিলেন প্রিয় নেতা এম, এন, লারমা।

১৯৭২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী এম, এন, লারমার নেতৃত্বে গঠিত হলো "পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি"। ইহা পার্বত্য চট্টগ্রামের একমাত্র ও প্রধান রাজনৈতিক সংগঠন। জন সংহতি সমিতির পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষি দশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি। সমিতির কাজ এগিয়ে চললো দুবার গতিতে। তার গতি অপ্রতিরোধ্য। সে চললো রাইফেলের বেয়নটের মাথায়; সে চললো মেশিন গানের গুলির মুখে। কোন কিছু রোধ করতে পারলো না সমিতির মহান কর্মকাণ্ড।

১৯৭৩ সাল। শুরু হলো নিয়মতান্ত্রিক লড়াই। ৭ই মার্চ্চ নির্বাচন হলো। বিপুল সংখ্যাধিক্যে জয়লাভ করলো এম, এন, লারমা পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তরাঞ্চল থেকে। দক্ষিণাঞ্চল থেকে জয়লাভ করলো চাথোয়াই রোয়াজা চৌধুরী। বিজয় উল্লাসে মেতে উঠলো জুম্ম জনগণ। খুশীতে আত্মহারা জনগণের মুখে ধ্বনিত হলো :—

এম, এন, লারমা জিন্দাবাদ
চাথোয়াই রোয়াজা জিন্দাবাদ
জন সংহতি সমিতি জিন্দাবাদ

এই শ্লোগানে মুখরিত হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের আকাশ বাতাস। পার্বত্য চট্টগ্রামের নারী পুরুষ শিশু আবাল বৃদ্ধ বনিতা মনে করলো তাদের অধিকার আদায়ের হাতিয়ার প্রস্তুত হলো। সুদৃঢ় ও সুগম হলো নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সংগ্রামের পথ।

বাংলাদেশের গণ পরিষদের অধিবেশন বসলো। অধিবেশনে যোগদান করার জন্য গেলেন জনগণের দুই প্রতিনিধি শুধু প্রতিনিধি নয় তাঁরা গেলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের ভাগ্য নিয়ন্তা হিসেবে। শুরু হলো অধিবেশন যথা নিয়মে। এই অধিবেশনে জুম্ম জনগণের একমাত্র আশা ভরসার গণ প্রতিনিধি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে নিপীড়িত, নির্বাচিত ও শোষিত জুম্ম জনগণের বাঁচার দাবী উথাপন করলেন। তিনি দাবী জানালেন—জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের একমাত্র চাবিকাঠি হচ্ছে নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন। তিনি আবেগময়ী ও অনলবর্ষী ভাষায় তুলে ধরলেন—বৃটিশ ও পাকিস্তান সরকারের আমলের নিপীড়িত নির্যাতন ও শোষণের কথা। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের আলাদা জাতি সত্তার কথাও দাবী করলেন। তিনি আশা করেছিলেন যেহেতু আওয়ামী লীগ সরকারও বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্বের জন্য ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করেছে সুতরাং জুম্ম জনগণের শোষন ও বঞ্চনার মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন।

কিন্তু ইতিহাসের কি নির্মম পরিহাস, যে বাঙ্গালীরা অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, সেই বাঙ্গালীরাই আজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে জুম্ম জনগণের ন্যায় সঙ্গত দাবীকে ঘৃনাভরে প্রত্যাখান করলো। উগ্র বাঙ্গালী মুসলমান জাতীয়তাবাদী বাংলাদেশ শুধু ওখানেই ক্ষান্ত হয়নি। গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের যুগোস পড়ে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানের এক কলমের খোঁচাতেই জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব লুপ্ত করে দিতে সংবিধানে লিপি বদ্ধ করলো— বাংলাদেশে যারা বাস করে তারা সবাই বাঙালী নামে পরিচিত হবে। আজীবন সংগ্রামীগণ প্রতিনিধি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এই সংবিধানের বিরুদ্ধে কড়া প্রতিবাদ জানালেন। তিনি সাহত ও দৃপ্ত কণ্ঠে জানালেন—"একজন বাঙালী কোন দিন চাকমা হতে পারে না অনুরূপ একজন চাকমা ও বাঙালী হতে পারে না"— এই বলে তিনি প্রতিবাদ স্বরূপ সংসদ কক্ষ থেকে বের হয়ে আসেন।

তারপর অধিবেশন শেষ করে তিনি তাঁর কর্মস্থলে ফিরে আসলেন। এদিকের তাঁর সহকর্মীরা অধিবেশনের ফলাফল শুনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি ফিরে এসে রাগে ও ক্ষোভে বললেন—"না, এ ভাবে আর হবে না।" অন্যপথ ধরতে হবে। তিনি বাংলাদেশ সরকারের হীন কার্যকলাপের চিত্র তুলে ধরলেন। এরপর অনেক আলাপ আলোচনা হলো। আলোচনায় সিদ্ধান্ত নেয়া হলো স্বায়ত্ব শাসনের দাবীতে পুনরায় ডেপুটেশন দেয়া হবে স্বয়ং শেখ মুজিবর রহমানের নিকট। এই ডেপুটেশনেও তিনি নেতৃত্ব দিলেন। যথা সময়ে ১৯৭৩ সালে প্রধান মন্ত্রীর সাথে বৈঠক বসলো। এখানেও দাবী করা হলো জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য স্বতন্ত্র শাসন ব্যবস্থা ও অধিকার। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের প্রত্যুত্তরে এম, এন, লারমা সহ ডেপুটেশনের সকল সদস্য হতবাক ও স্তম্ভিত না হয়ে পারেন নি। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান বললেন—"লারমা তুমি কি মনে কর। তোমরা আছ ৫/৬ লাখ। বেশী বাড়াবাড়ী করো না। চুপচাপ করে থাক। বেশী

বাড়াবাড়ি করলে তোমাদেরকে অস্ত্র দিয়ে মারবো না (হাতের তুড়ি মেরে মেরে তিনি বলতে লাগলেন) প্রয়োজনে ১, ২, ৩, ৪, ৫,—দশ লাখ বাঙ্গালী অনুপ্রবেশ করে তোমাদেরকে উৎখাত করবো, ধ্বংস করবো।" এই ভাবে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অধিকার আদায়ের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে গেলো।

বাংলাদেশ সরকারের কাছ হতে যখন আর কোন কিছু আশা করতে পারা গেল না তখন নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের পাশাপাশি অনিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের কথাও এম, এন, লারমা ভাবলেন। অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রামের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। অবশেষে, ১৯৭৩ সালে গড়ে উঠলো পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পতাকাতলে "শান্তি বাহিনী"। পাশাপাশি মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গড়ে উঠলো গ্রাম পঞ্চায়েত, মহিলা সমিতি, যুব সমিতি, ও মিলিশিয়া বাহিনী।

১৫ই আগষ্ট, ১৯৭৫ সাল এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আওয়ামী বাকশালী সরকারের পতন হয়। পরবর্তিত পরিস্থিতিতে আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার আন্দোলনের স্বার্থে মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা অভ্যুত্থানের পর পরই আত্মগোপন করেন এবং তখন থেকেই সরাসরি আন্দোলনের দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নিলেন।

১৯৭৭ সালে জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। জাতীয় সম্মেলন চললো বেশ কয়েকদিন ধরে। পার্টির কার্য সুষ্ঠু ও শক্তিশালী করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে পুনরায় এম, এন, লারমাকে পার্টির সভাপতি পদে নির্বাচিত করা হলো। শুরু হলো আবার শত্রু সরকারের অত্যাচার ও নিপিড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম। মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার নেতৃত্বে জুম্ম জনগণ আরো ঐক্যবদ্ধ হলো। পার্টি আরো শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগলো। অপরদিকে সামরিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ এম, এন, লারমার দক্ষ পরিচালনায় ও শিক্ষায় শান্তি বাহিনী ক্রমান্বয়ে এক শক্তিশালী ও সুশৃঙ্খল মুক্তি বাহিনীতে গড়ে উঠলো। শান্তি বাহিনীর সদস্যদের সাহস সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য, মনোবল ও সামরিক দক্ষতা দেখে শত্রু বাহিনীর মনে ত্রাসের সঞ্চার হলো। দেশে বিদেশে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার সংগ্রামের কথা, শান্তি বাহিনীর বীরত্বের কথাও প্রচার হতে লাগলো।

যুগে যুগে যেমন প্রতিক্রিয়াশীল সুবিধাবাদী গোষ্ঠি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারন করে আন্দোলনে কখনো হয়েছিল বিপ্লবী সংগ্রামী; আবার কখনো হয়েছিল প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী ও আপোষ পন্থী। আমাদের বিপ্লবী আন্দোলনেও প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদী চিন্তা-ধারার লোকেরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারন করে পার্টিতে কাজ করে আসছিল। তারা কখনো সেজেছিল প্রকৃত দেশপ্রেমিক, কখনো সেজেছিল বিপ্লবী, কখনো সেজেছিল বাস্তববাদী প্রগতিশীল ব্যক্তি আবার কখনো হয়েছিল উগ্র জাতীয়তাবাদী। সংগ্রামের বিভিন্ন স্তরে অভিনব রূপ ধারন করেছিল। কিন্তু এম, এন, লারমা অতি দক্ষতার সহিত সুকৌশলে এসবের মোকাবিলা করে আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিল।

এক দিকে জাতীয় শত্রু বাংলাদেশ সরকার অন্যদিকে গৃহশত্রু সুবিধাবাদী গোষ্ঠি - এই দুই শত্রুর সঙ্গে ক্রমাগত জনসংহতি সমিতি মোকাবিলা করে আসছে।

১৯৮২ সাল জাতীয় জীবনের ইতিহাসে এক দুর্যোগপূর্ণ দিন। এই বছরে এতদিনে লুকিয়ে থাকা সেই প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদী গোষ্ঠি মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলনের সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে ও ক্ষমতার লোভে উচ্চভিলাসী হয়ে সর্বো-পরি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক গুপ্তচর, দালাল ও ফড়িয়াদের চক্রান্তে জড়িত হয়ে এক উপদলীয় চক্রান্ত শুরু করে দেয়। ১৯৮২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বরে জাতীয় সম্মেলন শুরু হলো। এই উপদলীয় চক্রান্তকারীরা পার্টির নীতি ও কৌশল তথা নেতা ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তিক্ত সমালোচনা উপস্থাপন করে থাকে এবং সশস্ত্রভাবে ক্ষমতা দখলের ব্যর্থ অপপ্রয়াস চালায়। এই চক্রান্তকারীরা দ্রুত নিষ্পত্তির মতো অবাস্তব ও সস্তা শ্লোগানে বিভ্রান্ত করে রাতারাতি দেশ উদ্ধারের নীতি ও কৌশল প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ অপপ্রয়াস চালায়। কিন্তু মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার এবং তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব '৮২ সালের জাতীয় সম্মেলন সুসম্পন্ন হয়। এই সম্মেলনেও তৃতীয়বারের মতো সর্বসম্মতিক্রমে মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা পার্টির সভাপতি পদে নির্বাচিত হন।

কিন্তু ক্ষমতালোভী চক্রান্তকারীরা সম্মেলনের রায় মেনে নিলেও চক্রান্তের নাটক এখানে শেষ হলো না। সম্মেলনের পর এরা আবার নুতন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলো অতি সঙ্গোপনে, গোপন বৈঠকে তারা পার্টির সমান্তরাল আর একটি পার্টি সৃষ্টি করে সেখানে একটি সাত সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করলো। কমিটির নাম দিল জাতীয় গণ পরিষদ। এই ভাবে উপদলীয় কার্যকলাপ ক্রমান্বয়ে জোড়দার হতে লাগলো। তার বহিঃপ্রকাশ হলো ১৯৮৩ সালের মাঝামাঝি। চক্রান্তকারীরা কেন্দ্রীয় অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র ও গোলা-বারুদ যখন সরিয়ে ফেলতে থাকে তখন ১৪ই জুন কেন্দ্রীয় অনুগত বাহিনীর সাথে চক্রান্তকারীদের উস্কানিতে এক সংঘর্ষ বাঁধে। এভাবে গৃহযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠে। পার্টির সভাপতি এই সময়ে দৃঢ়তার সাথে পরিস্থিতির সাথে মোকবিলা করে যেতে থাকেন। তাঁর দৃঢ়তা, ধৈর্য্য, সাহস, মহানুভবতা ও ক্ষমাশীলতায় এই গৃহযুদ্ধ অবসান করানোর পথ উন্মুক্ত হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুর্নীতিবাজ প্রতিক্রিয়াশীল, ক্ষমতালোভী কুচক্র নিষ্পত্তিবাদীরা তাদের হীন উদ্দেশ্যে চরিতার্থ করার প্রয়াসে পার্টির গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ চূড়ান্তভাবে লঙ্ঘন করলো। গৃহযুদ্ধ চলতে থাকে। জুম্ম জাতির বৃহত্তর স্বার্থে পার্টির সভাপতি বিভেদপন্থী উপদলীয় চক্রান্তকারীদেরকে পুনরায় বৈঠকে

বসার জন্য আহ্বান জানালেন। এবং বিভেদপন্থীদের সবাইকে ক্ষমা ঘোষনা করলেন। এই ক্ষমা ঘোষনায় তিনি তাঁর মহানুভবতার ও ক্ষমাশীলতার এক নজীর স্থাপন করে জাতীয় ইতিহাসে মহান নেতার পরিচয়ে আরেকবার স্বাক্ষর রাখলেন। যথারীতি উভয় পক্ষের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। বৈঠকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন তথা জুম্ম জাতির মহান স্বার্থে গণতন্ত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে 'ভুলে যাওয়া ও ক্ষমা করা নীতির' ভিত্তিতে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। কিন্তু জুম্ম জাতীর কুলাঙ্গার, উচ্চাভিলাষী ও ক্ষমতালোভী চক্রান্তকারীরা জাতীয় স্বার্থের সবকিছু জলাঞ্জলী দিয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গুপ্তচর ও দালালদের উস্কানীতে উচ্চ পর্যায়ের গৃহীত সিদ্ধান্তের কালি শুকোতে না শুকোতেই ১০ই নভেম্বর ১৯৮৩ সালে চরম বিশ্বাস ঘাতকতা করে এক আতর্কিত সশস্ত্র হামলায় গিরি-প্রকাশ দেবেন পলাশ চক্র প্রিয় নেতা মানবেন্দ্র নারায়ন লারমাকে নির্মম ভাবে হত্যা করে। ফলে গৃহযুদ্ধ এক মারাত্মক পরিস্থিতির দিকে মোড় নেয়। এই ভাবে জুম্ম জাতির ভাগ্যাকাশে জুম্ম জাতির ভাগ্যাকাশে সবচেয়ে উজ্জল নক্ষত্রের জীবনাবসান হলো।

যিনি জুম্ম জাতির জাতীয় চেতনার উন্মেষ সাধন করেছিলেন, যিনি জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষনের লক্ষ্যে কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জুম্ম জনগণের মহান পার্টি-জনসংহতি সমিতি গঠিত হয়েছে যার পতাকাতলে দশটি ভিন্ন ভাষাভাষি জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে মহান আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, যাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতায় জুম্ম জাতী ধ্বংসের মুখোমুখী হয়েও আজ টিকে আছে, সেই মহান চিন্তাবিদ ও রাজনীতিবিদ মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার অকাল মৃত্যুতে সমস্ত পার্টি, শান্তি বাহিনী তথা জুম্ম জনগণের মুক্তি

এম, এন, লারমার সমাধি

সংগ্রামে নেতৃত্বের যে শুন্যতা সৃষ্ট হয়েছে তা সহজে পুরন হবার নয়। জুম্ম জাতির কর্ণধার, মহান দেশপ্রেমিক মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার অবদান জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রাম তথা বিশ্বের নিপিড়িত নির্যাতিত মানুষের সংগ্রামে চিরস্মরনীয় ও চির দেদীপ্যমান হয়ে থাকবে। তাঁর প্রদর্শিত পথ ও নির্দেশীত নীতি-কৌশল আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রামে একমাত্র দিশারী হয়ে থাকবে। মহান নেতার আত্মত্যাগ ও তিতিক্ষা যুগে যুগে দেশে দেশে প্রতিটি মুক্তিকামীর এক অনন্ত অনুপ্রেরনার উৎসস্থল।

প্রদীপ জ্বালাও

—শ্রীতরঙ্গা

মোহ ঘুমে অচেতন ছিল জুম্ম জাতি বিশ্বের অঙ্গনে
কে জাগাল তারে অকস্মাৎ—মহাজীবনের আহ্বানে ?
কে শোনাল সবার প্রথম মুক্তির জয়গান,
জুম্ম জাতিরে কে দিল প্রথম মানুষের সম্মান ?
এ জাতির মুক্তির স্বপ্নে সব কিছু দিয়ে বিসর্জন
অন্তহীন যাত্রা পথে বেছে নিল সংগ্রামী জীবন ?
শত্রু মুক্ত করি এ দেশের প্রতি ধুলি কনা—
জুম্ম জাতির সুখী সমৃদ্ধ সংসার করিতে রচনা
কঠোর সংগ্রামে যে পুরুষ দিলা আত্মবিসর্জন
সেই যে মহান ব্যক্তি বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ !
ঐ দেখ তার পুত দেহ প্রশান্ত আবেশে—
সংগ্রামী এ দেশের প্রতি ধুলি কনায় গেছে মিছে !
সবুজ ঘাসের বেদী ধরনীর অফুরন্ত ধন
উন্মুক্ত গগনেতে রচে তার রত্ন সিংহাসন !
এ আসন পূণ্য তীর্থ. জুম্মদের মহাতীর্থ স্থান
প্রদীপ জ্বালাও সেথা—উদ্ভাসিত হোক মুক্তির বিতান।

আমাদের কথা

পার্ব্বত্যবাসী

যেই মানবেন্দ্র নারায়ণ আলোকে হয়ে আলোকিত, চাকমা, ত্রিপুরা, মারমা লুসাই, বোম, মুরুং, খ্যাং, খুমী পাংখো, চাক-দশ জাতি হয়ে একত্রিত,

সমতালে চলি
বাঁধা বিঘ্ন পায়ে দলি
চিনিয়াছে আপনারে
ছুটিয়াছে এধারে ওধারে
খুঁজিতেছে উন্মুক্তবাতাস।
বুক বাঁধি উন্নতশিরে, তাকায় নীলাকাশে
হয়ে সে মানবেন্দ্র নারায়ণ তুমি,
খুঁজিতেছে তোমার অস্তিত্বের ভূমি।
এই তব নব আয়োজন
নব জাগরণ
এই তব পরিচয়
এই জাতির মৃত্যু নয়—নয়।

ঠিক, এ জাতির মৃত্যু নেই— ধ্বংসের পর ও আমরা অস্তিত্বহীন নহি। ঠিক, সেই আদর্শে এবং তাঁরই নেতৃত্বকে স্বীকার করে এগিয়ে যাবো সম্মুখ পানে আমরা যতক্ষণ না সক্ষম হই আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জনে। স্বাধিকার অর্জনে, আপোষের পথ খুলে, বিশ্বাস ও নিষ্ঠা সহকারে আন্তরিকতার মাধ্যমে চক্রান্তকারীদের সম্মুখে যেইভাবে এগিয়ে এসেছেন তিনি,— হায়রে ! নৃশংস ভাবে যারা তাঁকে হত্যা করলো তারা যে চির অমার্জনীয় এবং চির অকৃতঘ্ন,— এই সর্ব্ববাদী সম্মতি নিয়ে আমরা যারা বেঁচে আছি,— তাঁরই অসমাপ্ত কাজ সমাধান পথে এগিয়ে নিতে হবে যে আমাদের।

ভয়ভীতি বা সন্ত্রাস এনে আমরা পশ্চাতে পলায়ন করবোনা-করবোনা নতি স্বীকার মীর জাফরের কাছে। যাঁদের দেশ প্রেম, জাতি প্রেম প্রহসন মাত্র তাদেরকে বুকে নেওয়া বা তাদেরই সহযোগিতা প্রত্যাশা করা হবে আত্মহত্যারই সামিল।

হে প্রিয় দেশবাসী ! বার বৎসর পূর্বে আমরা চাকমা, মার্মা, ত্রিপুরা, লুসাই, বোম, মুরুং, খুমী, পাংখো, চাক— দশটি জাতি সম্মিলিত হয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণ পথ অর্জনে ঝুঁকে পড়েছিলাম, যাঁর আহ্বানে— সেই মানবেন্দ্র নারায়ন লার্মা আজ বিভেদপন্থীদের কর্তৃক নৃশংস ভাবে নিহত হলেও, তারই উত্তর সুরী হয়ে আমরা যে আছি এবং সম্মুখ পথে এগিয়ে গিয়ে সেই হত্যাকারীদের সমূলে ধ্বংস করে নেওয়াই হলো আমাদের প্রথম সোপান।

মনে রেখো, আমাদের সাহস আছে, বীরত্ব আছে,— সব চেয়ে আমরা একনিষ্ঠ ও ঐক্যবদ্ধ। আমাদের পায়ে চলার পথ যতই দুর্গম হোক অগ্রসর হবোই হবো। প্রয়োজন বোধে আমরা নিষ্ঠুর, নির্মম ও কঠোর হতে কুণ্ঠিত হবোনা,— হিটলারের পঞ্চম বাহিনী আমাদের কাছে কিছুই নহে—অথবা— এটম বোমার ধ্বংস আমাদের কাছে তুচ্ছ বটে।

হে প্রিয় দেশবাসী ! হে শান্তি বাহিনী সেনানী আসুন, এগিয়ে আসুন— লারমার নির্দ্দেশিত পথে আমরা এগিয়ে যাই, আমরা সফল হবোই হবো— একদিন প্রতি-ধ্বনিত হবে :—

আমরা ও বিশ্ববাসী
সেদিন মোদের মুখে ফুটিবে যে হাসি।
নিজ হস্তে নিজ মনে গড়িব এ দেশ।
সৃজিব নতুন করি নব পরিবেশ।

কিছু স্মৃতি কিছু কথা

—শ্রীববি

বর্ষা শেষ না হতেই শুরু হয়ে গেছে শীত। নভেম্বর মাস। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে এলোমেলো বিক্ষিপ্তভাবে। সামনের পাহাড়টাই ঢেকে গেছে ঘন কুয়াশায়। আমরা প্রত্যেকে ইউনিফর্মের উপরে শীতবস্ত্র চাপিয়েছি। ছাউনির সামনে যে মস্ত বড় বট গাছটা ছিল তার নীচেই আমাদের প্রতিদিনকার ফলইন্ হতো। তা ছাড়া খুব ভোরে উঠেই আমাদের কম্যাণ্ডার ও আমরা হাঁটাহাঁটি করতাম।

নিত্য নৈমত্তিকের মতো আমি খুব ভোরে অর্থাৎ ৩টার সময়ে উঠে নির্দ্দিষ্ট বাংকারে গিয়ে শত্রুর আক্রমনকে ঠেকাবার জন্য তৈরী হয়ে বসেছিলাম। হাতে অটোমাইফেলটা নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম শত্রুর আক্রমনের পাল্টা জবাব দিতে। কিন্তু, গত কালকের পরিশ্রম কেন জানিনা আমাকে বার বার পর্যুদস্ত করছিল। বাংকারে বসে ঝিমুচ্ছিলাম। মাঝে মাঝে হাই তুলছিলাম। লক্ষ্যই করিনি কম্যাণ্ডার অর্থাৎ সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট স্বাগত (মনিময় দেওয়ান) আমার পিছনে কখন এসে আমার অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করছিলেন। তিনি আমার কাঁধ পর্যন্ত ঝুকে বললেন— কি খুব ঘুম পেয়েছে বুঝি ? আমি চোখ মেলে তাকালাম। হ্যাঁ, সত্যিই আমি ঝিমুচ্ছিলাম। কম্যাণ্ডারের গুরু গম্ভীর আওয়াজে আমি কিছুটা আড়ষ্ট হলাম। পরক্ষনেই শুনলাম এভাবে অপ্রস্তুত হয়ে থাকলে শত্রুই তোমাকে আগে কাবু করবে। তিনি স্নেহে বললেন— যাও কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরাফেরা করো। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি বাংকারে বসে থাকলাম। আমি কিছুটা লজ্জিত হলাম আমার অপ্রস্তুত হয়ে থাকার জন্য। যা হোক, পরে আমি এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করলাম। এভাবেই শহীদ সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট স্বাগত যেমনি নিয়ম শৃঙ্খলার প্রতি সতর্ক তেমনি তাঁর সহযোদ্ধাদের প্রতিও সহমর্মী ছিলেন।

তখন আমাদের দেশে পুরোদমে এখানে ওখানে গৃহযুদ্ধের খণ্ড খণ্ড সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেছে। প্রতিদিন লড়াই হচ্ছে আমাদের সাথে বিভেদ পন্থীদের। ওরা বারে বারে আমাদের কাছ থেকে ভীষণ মার খাচ্ছিল। এমন অবস্থায় সামগ্রিক পরিস্থিতি সত্যিই দুঃখজনক, বিভীষিকাময় এবং শ্বাসরুদ্ধকর ছিল। লক্ষ্য করলাম কম্যাণ্ডারের লাল মুখখানাতে চিন্তার কালো মেঘ জমে যাচ্ছে। উনার স্থির চোখ দুটো সম্মুখ পানে নিবদ্ধ। উনি প্রায়ই চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন কিভাবে ধ্বংসাত্মক গৃহযুদ্ধের অবসানের একটা সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। কিভাবে সংহতি বজায় রেখে উগ্র বাঙালী মুসলমান জাতীয়তাবাদী বাংলাদেশ সরকারকে আঘাত করা যায়।

তখন প্রায় প্রতিটি কর্মী হতাশা নিরাশার দ্বন্দ্বে দোলায়িত হচ্ছিল ; কেননা বাংলাদেশ সেনাকে বড় ধরনের আক্রমণ করার আগেই আমাদের মধ্যে আত্মঘাতী সংঘর্ষ বেঁধে গেল। এবার জুম্ম জাতি সত্যি সত্যিই বুঝি ধ্বংস হয়ে যাবে। নয়ত বাংলাদেশ সরকারের গোলামীগিরি করে চিরদিন শৃঙ্খলিত অবস্থায় থাকতে হবে। প্রতিটি দেশপ্রেমিক কর্মী অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে ভুগছিল কেন এই আত্মঘাতী সংঘর্ষ। পরিস্থিতি পরিবর্তনের ফলে অবশ্য তা পরে ঝরণার পানির ন্যায় পরিষ্কার হয়ে গেল।

ভোর হতে না হতেই একজন কর্মী আমাদের ছাউনিতে এসে কিছু চিঠি দিয়ে গেল। আমরা কি খবর এসেছে জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে রইলাম। পর মুহূর্তে জানিয়ে দেওয়া হল যে আমাদের গৃহযুদ্ধ শীঘ্রই অবসান হয়ে যাচ্ছে। "ক্ষমা করা ও ভুলে যাওয়া নীতির" ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের বড় কর্মীরা অনাক্রমণ চুক্তিতে স্বাক্ষর প্রদান করেছেন ; আমরা খুশীতে ফেটে পড়লাম। ভাবছিলাম তাহলে এবার বিভীষিকাময় গৃহযুদ্ধের অবসান হবে। আমরা আবার একসাথে থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে যাবো। কিন্তু সে আশা অচিরেই গুড়ে বালিতে রূপান্তরিত হলো চার কুচক্রীদের ভয়াল ষড়যন্ত্রে। পরবর্তী পরিস্থিতি আরো ভয়ানক হলো তাদের অনমনীয় মনোভাবের ফলে। আমরা কস্মিন কালেও কল্পনা করতে পারলাম না যে, এই "ক্ষমা করা ও ভুলে যাওয়া" নীতির ভিত্তির রায় ও চুক্তিপত্র একটা বিভেদপন্থীদের পাতানো ফাঁদ বৈ কিছু নয়। এর সাথে কেন্দ্রের নির্দ্দেশনামা মতে আমাদের ছাউনিতে বন্দী দুজন কর্মীকে বিনা দ্বিধায় মুক্তি দিতে হবে এবং বিভেদপন্থীদের কাছ থেকে দখলকৃত যাবতীয় জিনিষপত্রাদি যথাযথভাবে ফেরৎ দিতে হবে তাছাড়া অচিরেই আমাদের ছাউনি গুটিয়ে আমাদের কোম্পানী হেড কোয়ার্টারে চলে যেতে নির্দেশ এলো।

৫ই নভেম্বর'৮৩, তল্পিতল্পাসহ আমরা নির্দ্দেশ মাফিক যাবার জন্য তৈরী হয়ে আছি। এখানে উল্লেখ করা ভালো আমি এবং কয়েকজন সৈনাকে বিশেষ কাজে বিশেষ কোম্পানী হেডকোয়ার্টারে যেতে হবে। তাই আমরা আগেই তৈরী হয়েছিলাম। এবার বিদায়ের পালা। আমরা প্রত্যেকের সাথে করমর্দন করে গন্তব্য স্থলে চলে গেলাম। জানলাম না এতদিন কার সাথীদের চিরবিদায় দিয়ে আমি চলে যাচ্ছি। আমি দূর হতে হাত নেড়ে আবার দেখা হবে সূচক ইঙ্গিত দিলাম। এখনো তাদের হাসি মাখা উজ্জ্বল মুখগুলো আমার মানস পটে ভেসে উঠছে ; সে সব সাথীদের গৃহযুদ্ধের অবসানের সংবাদে খুশী হবার চিত্রগুলো।

তারপর মাত্র পাঁচ দিন পর জুম্ম জাতির জাতীয় ইতিহাসে কলঙ্কিত অধ্যায় রচনা করলো চার কুচক্রীরা। ১০ই নভেম্বর' ৮৩ সালের ষড়যন্ত্রমূলক আক্রমণে আমার সেই প্রিয় কম্যাণ্ডার লে: লে: স্বাগত নির্মমভাবে প্রাণ হারালো। প্রাণ হারালো জুম্ম জাতির মুক্তির পথ প্রদর্শক পরম শ্রদ্ধেয় মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা। পার্টির কর্ম তথা সর্বস্তরের জনসাধারণের বুঝতে বাকী রইলোনা বিভেদপন্থীরা আমাদের সাথে আর জাতির সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কর্মীদের মধ্যে নূতন করে প্রতিশোধ স্পৃহা বেড়ে গেলো; জনসাধারণ হলো প্রতিবাদ মুখর। জনসাধারণের আর বুঝার বাকী রইলোনা লার্মা হত্যার পিছনে কুচক্রীদের জঘন্য ষড়যন্ত্র হচ্ছে ক্ষমতা দখল করার উচ্চাভিলাষ ও রাজনৈতিক ব্যাভিচার।

"কথায় বলে ধর্মের ঢোল আপনি বাজে"। বিভেদপন্থীদেরও তাই হলো। তাদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত আরও কোন্দল বাড়লো, রচিত হতে থাকলো অভিনব উপষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে প্রাণ হারালো চার কুচক্রীর অন্যতম নায়ক দেবেন তাদের এককালের বিশ্বস্ত সহচরদের হাতে। এটাই সত্য হয়ে থাকবে পৃথিবীর ইতিহাসের বুকে যারা ক্ষমতার উচ্চাভিলাষী হয়ে, জনগণের স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়ে, ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করতে চায়, তাদেরও একদিন না একদিন বড়ই করুণভাবে পৃথিবীর বুক থেকে চির-বিদায়—নিতে হয়।

জনগণ আজ অনুধাবন করতে পেরেছেন যে, গৃহযুদ্ধ বেশীদিন টিকে থাকতে দিলে জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রাম নস্যাৎ হতে বাধ্য। কাজেই আমাদের সবারই প্রয়োজন হবে গৃহযুদ্ধের ধ্বংসলীলা রোধ করা। যারা আজ মিথ্যার বুলি আওড়িয়ে ষড়যন্ত্র করে জনসাধারণের আশা আকাঙ্খাকে ধূলিস্যাৎ করছে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো।

১০ই নভেম্বর' ৮৩ জুম্ম জাতির জাতীয় ইতিহাসে চিরদিন ন্যায় ও সত্যের জন্য সংগ্রাম করার অনুপ্রেরণা যোগাবে। যোগাবে মুক্তির চেতনা। যারা আজ আমাদের কাছ থেকে চিরতরে হারিয়ে গেছে তাদের অকৃত্রিম দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ আমাদের হৃদয়ের মাঝে দেদিপ্যমান হয়ে প্রজ্জলিত করবে মাতৃভূমির প্রতি অগাধ প্রেম শিখা। শহীদদের স্মৃতি বুকে ধারণ করে আমাদের আরো ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে যেতে হবে সামনে, যেখানে রয়েছে জুম্ম জাতির চির আশা আকাঙ্খা।

আজ এই ১০ই নভেম্বর ১৯৮৬, দিনে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি সেই সব শহীদদেরকে যারা অকুতোভয়ে জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রামে নিজেদের অমূল্য জীবন উৎসর্গ করেছেন।

আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলন ও পাহাড়ী ছাত্র সমিতি

—শ্রীজিমি

তৃতীয় দুনিয়ার অনুন্নত দেশসমূহে ছাত্রসমাজের ভূমিকা অপরিসীম। পশ্চাৎপদতা, অনগ্রসরতা, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, শাসন-শোষণের কারণে এসব দেশের জনসাধারণ সাধারণতঃ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সাহস পায়না। স্বভাবতঃই শিক্ষিত এবং অধিকার সচেতন ও সংগ্রামী অংশের উপরই দায়িত্ব এসে বর্তায় সংগ্রামের পুরোভাগে এসে সামিল হওয়ার। সমাজের অনেক বাঁধন থেকে মুক্ত এবং কৈশোর-যৌবনের উদ্দামতা প্রাণ চাঞ্চল্যতা ছাত্র সমাজকে সংগ্রামী হতে প্রেরণা জোগায়। তাইতো যুগে যুগে ছাত্র সমাজ সমাজ সংগ্রামী কাফেলায় শরীক হয়ে অমর কীর্তি রেখে গেছে— এক নায়ক ও স্বৈরাচারী শাসক শোষক গোষ্ঠীর পতন ঘটাতে রক্তের আঁচড়ে ইতিহাস রচনা করে গেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম ছাত্র সমাজও এর থেকে ব্যতিক্রম নয়। জুম্ম জাতির জাতীয় চেতনা উন্মেষ সাধনে পাহাড়ী ছাত্র সমাজ বরাবরই এক অনন্য ভূমিকা পালন করে এসেছে। ১৯১৫ সালের যুবক সমিতি—১৯২৮ সালের যুবক সংঘ গড়ে উঠেছিল পাহাড়ী ছাত্র সমাজের সমাজ সচেতনতা ও দেশ সেবার মনোবৃত্তি থেকে আর এ সবের নেতৃত্বেই পাহাড়ী ছাত্র সমাজ। সমাজে জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম ছাত্র সমাজই সর্বপ্রথম স্বৈরাচারী সামন্ত নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেছিল। সর্বোপরি ভারত বিভক্তির সময়কালীন ও অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতে অন্তর্ভূক্ত করার ক্ষেত্রে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হলো। অমুসলমান প্রধান এলাকা হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের মধ্যে আইনসংগত ভাবে অন্তর্ভূক্তি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোন এক অদৃশ্য কালো হাতের ষড়যন্ত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে মুসলমানের আবাসভূমি পাকিস্তানের জলন্ত গহ্বরে নিক্ষেপ করা হলো।

পাঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলার জিরা ও ফিরোজপুর মহকুমা পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার কথা ছিল (বেঙ্গল বাউণ্ডারী কমিশনের

৮ই আগষ্ট ১৯৪৭ সালের রেড ম্যাপ সীট অনুযায়ী। কিন্তু Major Billy short এর সুপরিশক্রমে রেড ক্লিফ ও মাউন্ট ব্যাটেন ৯ই আগষ্ট ১৯৪৭ সালে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন যে — জিরা ও ফিরোজপুরের পরিবর্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে। রেড ক্লিফ ও মাউন্ট ব্যাটেনের এক কলমের খোঁচায় জুম্ম জনগণের দুর্ভাগ্যের লিখন লিখা হয়ে গেলো। দিল্লীর রয়েল ভবনের দেওয়াল ডিঙ্গিয়ে রাঙ্গামাটির এ্যাকশান কমিটির স্বোচ্চার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর তাদের কর্ণকুহরে পৌছাতে পারলোনা। এ্যাকশন কমিটির প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর কেবল পার্বত্য চট্টলার পাহাড়ের অন্দরে-কন্দরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে মিলিয়ে গেল মাত্র। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস— জুম্মদের ধ্বংসের পরোয়ানা জারী হওয়া সত্বে ও সে সময়ে জাতীয় নেতৃত্ব এগিয়ে এলোনা জুম্ম জনগণকে নিশ্চিত ধ্বংস থেকে রক্ষা করার তাগিদে এখানেই ট্রাজেডী।

কিন্তু জুম্ম ছাত্র সমাজ নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকেনি। উগ্রধর্মান্ধ ও স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকারের হীন কার্যক্রম খুবই গভীরভাবে নিরীক্ষণ করতে থাকে। জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব বিলুপ্তির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কিভাবে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায় তার উপায় খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রইল। একদিকে ব্রিটিশ প্রদত্ত অগণতান্ত্রিক ঔপনিবেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনবিধি আর অপরদিকে পাকিস্তান সরকারের জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্তিকরণের হীন ষড়যন্ত্র— জুম্ম জনগনের জাতীয় জীবনে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। ১৯৪২ সালের ভারা আন্দোলন ইন্দো-চীনের মুক্তি সংগ্রাম নব্যশিক্ষিত ও জুম্ম ছাত্র সমাজের মধ্যে দারুণ রেখাপাত করে। সর্বোপরি বিশ দশকের মাঝামাঝি থেকে চল্লিশ দশক পর্য্যন্ত জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ও সমাজে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে সংগ্রাম অব্যাহত ছিল তা থেকে পঞ্চাশ দশকের জুম্ম ছাত্র সমাজ যথেষ্ট অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল। সুতরাং যখন পঞ্চাশ দশকের প্রারম্ভ থেকেই বেআইনী বাঙ্গালী মুসলমান অনুপ্রবেশকরণ ও সুকৌশলে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি পাকিস্তান সরকার স্বীয় স্বার্থে ব্যবহার করতে থাকে তখন আর সচেতন ও আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকারকামী জাগ্রত ছাত্র সমাজ চুপ করে থাকতে পারেনি। তাই ১৯৫৬ সালেই অনন্তবিহারী খীসা ও সুধাকর খীসার নেতৃত্বে জুম্ম ছাত্র সমাজ সম্মিলিত হয়ে পাহাড়ী ছাত্র সমিতি পুনরুজ্জীবিত করে। এইভাবে জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষনের সংগ্রাম নূতনরূপে জন্মলাভ করে। শুরু হলো জাতীয় উন্মেষ সাধনের অব্যাহত প্রচেষ্টা। ১৯৬০ সালের কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, মৌলিক গণতন্ত্র চালুকরণ, ১৯৬৩ সালের পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে শাসনতান্ত্রিক সংশোধন, বেআইনী মুসলমান অনুপ্রবেশকরন ,প্রায় ষাট হাজার জুম্ম নরনারীর প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও বার্মাতে দেশান্তরী হওয়া ষাট দশকের চরম গাত্রদাহ ছাত্র আন্দোলনকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে নিয়ে যায়।

১৯৬৭ সালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত পাহাড়ী ছাত্র সম্মেলন এক নব দিগন্ত উন্মোচিত করে। শ্লোগান উঠলো— গ্রামে ফিরে যাও জুম্ম জনতাকে অধিকার সচেতন করে তোল ঘুনেধরা প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত নেতৃত্বের উপর আঘাত হানো শুরু হলো নূতন পদযাত্রা। কাপ্তাই বাঁধে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ ও সুষ্ঠ পুনর্বাসন না দেওয়ার জন্য ছাত্রনেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পাকিস্তান সরকারের হীন কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেন. এতে স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার ১৯৫৮ সালের নিরাপত্তা আইনে তাঁকে ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩ সালে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করে ছাত্র আন্দোলন নস্যাৎ করে দিতে ব্যর্থ অপপ্রয়াস চালায়। ১৯৬৪ সালে ঠেগা অঞ্চলস্থ চাকমাদের উপর মিজোদের লেলিয়ে দিয়ে পাকিস্তান সরকার এক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে। এর প্রতিবাদে পাহাড়ী ছাত্র সমিতি রাঙ্গামাটিতে এক ঐতিহাসিক মিছিল করে ডেপুটী কমিশনারের নিকট এক প্রতিবাদ লিপি প্রদান করে এবং প্রতিবাদ সভাও অনুষ্ঠিত করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে কানাচে জুম্ম ছাত্র সমাজ একদিকে উগ্রধর্মান্ধ পাকিস্তান সরকারের জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র আর অপরদিকে অযোগ্য ও প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয় নেতৃত্বের দুর্বলতা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে থাকে। ১৯৬৫ সালে রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বপ্রথম একটা বেসরকারী কলেজ স্থাপিত হয়। এতে সমগ্র শিক্ষাঙ্গন তথা জাতীয় জীবনে নবজীবনের এক দিগন্ত প্রসারিত হলো। পাহাড়ী ছাত্র সমাজের অনেকদিনের দাবী পূরণ হলো। পরের বৎসর ১৯৬৬ সালে পাহাড়ী ছাত্র সমিতি কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঢাকা থেকে রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তরিত করা হলো। উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে পাহাড়ী ছাত্র সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয় নূতন করে রাঙ্গামাটি কলেজ ভবনে উদ্বোধন করা হলো। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রবীন ছাত্র নেতা ও শিক্ষাবিদ সন্তু লারমা প্রধান অতিথি হিসাবে তার ভাষণে পাহাড়ী ছাত্র সমাজকে দেশ গঠনের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান রাখেন।

ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ইতিমধ্যে পাহাড়ী ছাত্র সমিতির এককালের অনেক সক্রিয় সদস্য শিক্ষা সমাপণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে কানাচে দেশ গঠনের কাজে আত্মনিমগ্ন ছিলেন। অধিকাংশই শিক্ষকতায় নিযুক্ত থেকে একদিকে জুম্ম জনগণকে অধিকার সচেতন করে তুলতে থাকেন অপরদিকে রাজা-হেডম্যান-কার্বারী এই দিনে গঠিত ঘুনেধরা আপোষমুখী জাতীয় নেতৃত্ব পরিবর্তনে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। সর্বোপরি স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকারের ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপে বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জুম্ম জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে থাকে। তাঁদেরই নেতৃত্বে নূতন নূতন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে লাগলে। শ্লোগান উঠলো—লেখাপড়া শিখতে হবে-শিক্ষা ছাড়া জুম্ম জাতির মুক্তি নেই।

সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে এক নূতন জীবনের অধ্যায় সূচিত হলো।

পাহাড়ী ছাত্র সমিতি ১৯৬৫ সাল থেকে সমিতির শাখা সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে সম্প্রসারিত করতে থাকে। গোটা ছাত্র সমাজ ছড়িয়ে পড়লো। তারা জুম্ম জনগণের মধ্যে গিয়ে জাতীয় ইতিহাস ও জাতীয় নেতৃত্ব সম্পর্কে বক্তব্য দিতে লাগলো। জাতি হিসেবে বেঁচে থাকতে চাইলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া চাই আর ঐক্যবদ্ধ হয়ে সর্বপ্রকারের অত্যাচার অবিচার, শাসন ও শোষনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যেতে হবে তবেই তো দেশ-জাতি হিসেবে টিকে থাকা সম্ভবপর। এ ভাবে চলতে থাকে জাতীয় চেতনা উন্মেষের কর্মকাণ্ড। তখন সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ছয় দফা আন্দোলনের জোয়ার। এই জোয়ারে পাহাড়ী ছাত্র সমিতির তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের সচেতন বুদ্ধিজীবি সমাজ ও সিক্ত না হয়ে পারেনি। এই সময়েই পার্বত্য চট্টগ্রামে গঠিত হয় শিক্ষক সমিতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয় কল্যান পরিষদ। এই পরিষদ গঠনে পাহাড়ী ছাত্র সমিতির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। মংসাপ্রু চৌধুরী, বীর কুমার চাকমা (প্রয়াতঃ), রূপায়ন দেওয়ান, স্নেহময় চাকমা, মংচাবাই মারমা, গৌতম কুমার চাকমা, প্রশান্ত কুমার চাকমা (শহীদ), উষাতন তালুকদার প্রমুখ পাহাড়ী ছাত্র সমিতির ছাত্র নেতাদের বলিষ্ঠ ভূমিকায় ছাত্র আন্দোলন দুবার গতিতে এগিয়ে যেতে থাকে। এইভাবে শুরু হলো জাতীয় উন্মেষ সাধন ও জাতীয় নেতৃত্ব গড়ে তোলার মহান কর্মকাণ্ড। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, সন্তু লারমা, অনন্তবিহারী খীসা, জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, বীরকুমার চাকমা, মংসাপ্রু চৌধুরী, রূপায়ণ দেওয়ান, প্রশান্ত চাকমা, গৌতম কুমার চাকমা, উষাতন তালুকদার প্রমুখ নেতৃত্বে উপজাতীয় কল্যাণ পরিষদ ও পাহাড়ী ছাত্র সমিতি একযোগে দেশ গঠনের কাজ করে যেতে থাকে।

১৯৭০ সালের পাহাড়ী ছাত্র সমিতির বার্ষিক সম্মেলন রাঙ্গামাটি হুন্দুপুরী সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিক্রিয়াশীল সরকার এই সম্মেলন বানচাল করে দিতে উদ্যত হয়। কিন্তু সমাগত প্রতিনিধিরা সার্থকভাবে এই সম্মেলন সম্পন্ন করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিসহ পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে অধ্যয়নরত পাহাড়ী ছাত্র প্রতিনিধি এই মহতী সম্মেলনে উপস্থিত থাকে। জুম্ম জনগণের ন্যায্য অধিকার সহ জুম্ম ছাত্র সমাজের শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আদায়ের সংগ্রামী শপথ নিয়ে এই সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

১৯৭০ সালেই পাকিস্তান জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দেশপ্রেমিক ও সচেতন বুদ্ধিজীবি সমাজ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, সন্তু লারমা ও অনন্তবিহারী খীসার নেতৃত্বে পাহাড়ী ছাত্র সমিতির উদ্যোগে এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে এবং "পার্বত্য চট্টগ্রাম নির্বাচন পরিকল্পনা কমিটি" গঠন করে। নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত স্বায়ত্বশাসনসহ শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মোট ষোলটি দাবী জানিয়ে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। জুম্ম জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের এই প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বকে সাদরে বরণ করে নেয়। আওয়ামী লীগের প্রার্থীসহ অন্যান্য সকল প্রার্থীকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা প্রাদেশিক পরিষদে সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। কাজে কাজেই পাহাড়ী ছাত্র সমিতির নেতৃত্বে জুম্ম ছাত্র আন্দোলন দুর্বার হয়ে উঠে।

১৯৭১ সাল— শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ। এই সময়ে পাহাড়ী ছাত্র সমিতিও চুপ করে বসে থাকতে চায়নি। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে ছাত্র যুব সমাজ মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসলো। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক পার্বত্য চট্টগ্রামের তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার এইচ. টি. ইমাম ও আওয়ামী লীগের পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা কমিটি হীন উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে ছাত্র-যুব সমাজকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণে বিরত থাকতে নানাভাবে প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। ফলে শত শত জুম্ম ছাত্র যুবক এই মুক্তিযুদ্ধ থেকে দূরে সরে থাকতে বাধ্য হয়। তা সত্ত্বেও ভিন্ন উপায়ে অনেক জুম্ম ছাত্র-যুবক এই মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে থাকে। বলা বাহুল্য জুম্ম জনগণও এই আন্দোলনকে সক্রিয় ভাবে সমর্থন জ্ঞাপন করেছিল।

১৯৭১ সাল— মুক্তিযুদ্ধে পশ্চিমা হানাদার বাহিনী পরাজিত হলো। নূতন দেশ বাংলাদেশের জন্ম হলো। প্রবেশ করলো মুক্তিবাহিনী।

ছাত্র সমাজ তথা জুম্ম জনগণ আশা করেছিল এইবার পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের সুদিন ফিরে আসবে। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেলো তার বিপরীতটাই— মুক্তি বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশের সাথে সাথে শুরু করলো লুন্ঠন, ধর্ষণ, ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া, হত্যা, মারপিঠ ইত্যাদি বিভীষিকাময় হীন কার্যকলাপ; এমনকি ধর্মীয় মন্দির ও মন্দিরের পুরোহিতরাও মুক্তিবাহিনীর অত্যাচার অবিচার থেকে রেহাই পেলোনা। জুম্ম ছাত্র সমাজ এসবের বিরুদ্ধে ফেটে পড়লো, আরো ঐক্যবদ্ধ হতে লাগলো। পাহাড়ী ছাত্র সমিতি এই অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠলো। তাই ঐক্যবদ্ধ ছাত্র সমাজ পাহাড়ী ছাত্র সমিতির নেতৃত্বে জেল-জুলুম, লুন্ঠন, গণহত্যা, নারীধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদির প্রতিবাদে রাঙ্গামাটিতে ১৯৭২ সালের ৯ই জুন ঐতিহাসিক সর্বদলীয় ছাত্র মিছিল করে। জঙ্গী মিছিলের মাধ্যমে সারা রাঙ্গামাটি শহর প্রদক্ষিণ করে ডেপুটি কমিশনারের নিকট বিভিন্ন দাবী সম্বলিত এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়। মিছিল শেষে এক সভা করা হয় কোর্ট বিল্ডিং ময়দানে। মিছিল অনুষ্ঠিত করার ব্যাপারে গুটি কয়েক প্রতিক্রিয়াশীল ছাত্র বিরোধিতা করে কিন্তু দেশপ্রেমিক ছাত্র সমাজের কাছে কোন বাধাই ঠেকেনি— ছাত্র সমাজ ক্ষোভ অসন্তোষ ও বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। স্মারকলিপিতে নিম্নোক্ত দাবীসমূহ উত্থাপন করা হয়—

ক) পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য স্বায়ত্বশাসন প্রদান করতে হবে;

খ) বিনাবিচারে আটককৃত বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি প্রদান

করতে হবে ;

গ) গণহত্যা বন্ধ করতে হবে ;

ঘ) নারী নির্যাতন বন্ধ করতে হবে ;

ঙ) কাপ্তাই বাঁধ মরণ ফাঁদের ফলে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দিতে হবে ;

চ) পাহাড়ী ছাত্রদের অধিকতর সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে।

১৯৭২ সালে এক নূতন উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে পাহাড়ী ছাত্র সমিতির বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বাংলাদেশ সরকারের হীন ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এবং জুম্ম জনগণের স্বায়ত্বশাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আরো জোড়ালো করার বজ্র কঠোর শপথ গ্রহণ করা হয়। সন্তু লারমা এই সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জুম্ম ছাত্রসমাজকে সকল সংকীর্ণতা থেকে উর্দ্ধে থেকে জাতীয় স্বার্থে আরো ঐক্যবদ্ধ ও সংগ্রামী হওয়ার আহ্বান রাখেন।

ঘটনাপ্রবাহ দ্রুত পট পরিবর্তন হতে থাকে। বাংলাদেশের সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করে পৃথক অস্তিত্ব এক কলমের খোঁচায় মুছে দেওয়া হলো। জুম্ম জনগণকে বাংগালী মুসলমান হিসেবে সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হলো। জুম্ম ছাত্র সমাজ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। এই সময়েই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে জন্মলাভ করলো "পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি"। এই সমিতি জাতীয় পর্যায়ে একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন। পাহাড়ী ছাত্র সমিতির নেতৃত্বে সমগ্র জুম্ম ছাত্র সমাজ জনসংহতি সমিতির পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হলো। আর জনসংহতি সমিতির পাশাপাশি থেকে পাহাড়ী ছাত্র সমিতি স্বায়ত্বশাসনের আদায়ের সংগ্রাম চালিয়ে নিতে থাকে।

১৯৭৩ সালের পাহাড়ী ছাত্র সমিতির বার্ষিক সম্মেলন যথারীতি আরম্ভ হয়। উগ্র বাংগালী মুসলমান জাতীয়তাবাদী বাংলাদেশ সরকার এই সম্মেলন বানচাল করে দিতে প্রতিক্রিয়াশীল ছাত্রমহলকে লেলিয়ে দেয়। অস্ত্রের হুমকী পর্যন্ত দিতে থাকে। কিন্তু দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবী ছাত্রসমাজ এই সব ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিয়েই সম্মেলন স্বার্থকভাবে সম্পন্ন করে। সম্মেলনে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে অধিকার আদায়ের সংগ্রাম অব্যাহত গতিতে চালিয়ে নিতে নূতন করে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হয়। এইভাবে শুরু হয় নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জুম্ম জনগণের প্রাণের দাবী আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের আদায়ের সংগ্রাম।

১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ্চ বাংলাদেশ গণপরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। পাহাড়ী ছাত্র সমিতি জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে এই নির্বাচনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। সচেতন জুম্ম জনতা ও পাহাড়ী ছাত্র সমিতির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জনসংহতি সমিতি আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের বিপুল ভোটে পরাজিত করে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও চাইথোয়াই রোয়াজাকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে। স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠে। জুম্ম জনগণ অধিকার আদায়ের সংগ্রামে আরো সক্রিয় ও সংগ্রামী হয়ে উঠে। পার্বত্য চট্টগ্রামের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবি তথা দশ ভাষাভাষি আপামরজনসাধারণ আরো ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠে। আর বাংলাদেশ সরকারের সর্বপ্রকারের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যেতে থাকে।

পাহাড়ী ছাত্র সমিতি শুধু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও ছাত্রসমাজের শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা নিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি। সেই সাথে জুম্ম ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রেও এক অনন্য ভূমিকা পালন করে। জুম্ম সংস্কৃতির বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে পাহাড়ী ছাত্র সমিতির নেতৃত্বে গড়ে উঠে "গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠী"। দেশাত্মবোধক গান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ঘুমন্ত জুম্ম জাতিকে জাগ্রত ও ঐক্যবদ্ধ করার মহান কর্মকাণ্ড পাহাড়ী ছাত্র সমিতি এই গিরিসুরের মাধ্যমে চালিয়ে যেতে থাকে।

১৯৭৭ সালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে জুম্ম নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা ও জুম্ম জনগণের দাবী দাওয়া উত্থাপন করার জন্য যে প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন সেখানে পাহাড়ী ছাত্র সমিতিও এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পাহাড়ী ছাত্র সমিতি বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের সাথেও যোগাযোগ করতে থাকে। যেখানেই জনসংহতি সমিতি সেখানেই পাহাড়ী ছাত্র সমিতি। সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রামের যুব আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য পাহাড়ী ছাত্র সমিতির উদ্যোগে ও জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে ১৯৭৩ সালে জাতীয় যুব ফেডারেশন নামে একটি যুব সংগঠন গঠন করা হয়।

জনসংহতি সমিতি, পাহাড়ী ছাত্র সমিতি সর্বোপরি জুম্ম জনগণের পক্ষ থেকে বার বার প্রতিনিধিত্ব করা সত্বেও বাংলাদেশ সরকার জুম্ম জনগণের মৌলিক সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসেনি বরঞ্চ পরিবর্তে জুম্ম জনগনকে বাঙ্গালী মুসলমানে পরিণত করা হলো —লুণ্ঠন, ধর্ষণ, হত্যা, ধরপাকড় ও অন্যান্য নাশকতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখলো সর্বোপরি বেআইনী বাঙ্গালী মুসলমান অনুপ্রবেশ বেড়ে গেলো। বৈদেশিক আক্রমনের দোহাই দিয়ে দিঘীনালা, আলিকদম ও রুমাতে সেনানিবাস করা হলো। পুলিশ বি,ডি,আর এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলো। গণপ্রতিনিধির মাধ্যমে পেশকৃত জুম্ম জনগণের সকল দাবী ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যাত হতে লাগলো। ফলে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আদায়ের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যেতে লাগলো। তাই জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে পাহাড়ী ছাত্র সমিতিও অনিয়মতান্ত্রিক তথা সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নিতে বাধ্য

হলো।

শুরু হলো জুম্ম জনগণের মৌলিক অধিকার আদায়ের এক নবতর অথচ কঠোর জীবন-মৃত্যুর সংগ্রাম। জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে গড়ে উঠলো শান্তিবাহিনী। পাহাড়ী ছাত্র সমিতির বিপ্লবী কর্মীরা দলে দলে শান্তিবাহিনীতে যোগ দিতে লাগলো। পাহাড়ী ছাত্র সমিতির নেতৃস্থানীয় কর্মীগণ আত্মগোপনে গিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে থাকে। সেইসাথে জুম্ম জনগণকে সশস্ত্র সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আদায়ের সংগ্রাম জোরদার করতে থাকে। পাহাড়ী ছাত্র সমিতির এই বলিষ্ঠ ও যুগোপযোগী মহা সিদ্ধান্তে অচিরেই আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে।

আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আদায়ের সশস্ত্র সংগ্রাম আজ এক যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। আন্দোলনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পাহাড়ী ছাত্র সমিতির নেতৃত্বে জুম্ম ছাত্র সমাজ যেই স্বাক্ষর রেখেছে তা চিরদিন অম্লান ও গৌরবোজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রামে যারা এ পর্যন্ত নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন তাঁরা একদিন প্রায় প্রত্যেকেই পাহাড়ী ছাত্র সমিতির সক্রিয় ও নেতৃস্থানীয় সদস্য ছিলেন। পাহাড়ী ছাত্র সমিতির অবদান বিস্মৃতি হবার নয়। জাতীয় উন্মেষ সাধনে ও আন্দোলনের প্রতিটি পদচারনায় পাহাড়ী ছাত্র সমিতির কালজয়ী ভূমিকা জুম্ম জাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকবে।

কালের চক্রে ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে পাহাড়ী ছাত্র সমিতি শাসক-শোষক গোষ্ঠীর দ্বারা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সর্বোপরি আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের জোয়ারে পাহাড়ী ছাত্র সমিতির ভূমিকা আজ বাহ্যতঃ স্তিমিত ও নিষ্ক্রিয় মনে হলেও তা বাস্তব নয়। এটা সত্য যে জাতীয় উন্মেষ সাধনে ও আন্দোলন গড়ে তোলার প্রাক্কালে পাহাড়ী ছাত্র সমিতি যে ভূমিকা পালনে সমর্থ হয়েছে বর্তমানে সে ভূমিকা পালন করা যেমনি সম্ভবপর নয় তেমনি কারো আশা করাও বাস্তববিবর্জিত।

যুগে যুগে সকল দেশের ছাত্র সমাজ দেশ ও জাতির মুক্তি সংগ্রামে স্বাতন্ত্র্যও মহিমান্বিত ভূমিকা পালন করে এসেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম ছাত্র সমাজও অবশ্যই তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র যাদের জাতীয় উন্মেষ সাধনে ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন সংগঠনে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ও মৌলিক ভূমিকা ছিলনা, সেই উচ্চাভিলাষী ও ক্ষমতা-লোভী চক্রান্তকারীদের দ্বারা সৃষ্ট গৃহযুদ্ধের কারণে জুম্ম ছাত্র সমাজের অংশ বিশেষ বিভ্রান্ত হলেও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে সংগ্রামী দেশপ্রেমিক জুম্ম ছাত্র সমাজ স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে পূর্বের মতই দৃঢ় সংকল্প ও সংহত। জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রামে পাহাড়ী ছাত্র সমিতি দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যাবেই।

স্মৃতির মনিকোঠায় একটি দিন

—শ্রীমতী নন্দিতা

কলম হাতে নিয়ে এমন একটি দিনের স্মৃতি রোমন্থন করছি যা লক্ষ লক্ষ মনের কাছে বিহবল শাশ্বত জিজ্ঞাসায় চিরজাগরূক—কী করে ঘটলো? কেন এই পরিনতি? ঘটনা নির্বাক শোকে পাষান মানুষের নিকট একটিই শুধু উত্তর — ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। তাই তো বিভীষন মীরজাফরের সৃষ্টিতে নূতনত্ব কিছু নেই। ১০ই নভেম্বর ১৯৮৯ সালের নৃশংস মর্মান্তিক ঘটনা স্বাক্ষ্য বহন করে বিভেদপন্থী কুচক্রীরা কত নিচুর ও ক্ষমতা লোভী। যার ফলে এমন জঘন্যতম হীন কাজে লিপ্ত হতে তাদের বিবেকে এতটুকু ও কুণ্ঠাবোধ জাগেনি।

ক্ষমতা লোভের তীব্র লালসা নিয়ে গিরি, প্রকাশ, দেবেন ও পলাশ চক্র যখন ধ্বংশলীলায় মত্ত সুদীর্ঘ বারটি বছরের ধাপে ধাপে এগিয়ে আসা অগ্রগতিকে দাঁড়ালো পথরোধ করে তখন যুগ যুগ ধরে অধিকার বঞ্চিত, অবহেলিত জুম্ম জনগণ নিজেদের বিপন্ন অস্তিত্বের কথা অনুধাবন করে আর্তনাদ করে উঠেছিল — 'আর নয় হানাহানি, থামাও রক্তপাত। অন্যদিকে পার্টি ও দেশ-জাতির স্বার্থে ষড়যন্ত্র বানচাল করে দেবার জন্যে চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম চালিয়ে যায়। কেন্দ্রীয় বাহিনীর এহেন আক্রমনে অতীষ্ট হয়ে উপায়ান্তর না দেখে কুচক্রীরা সমস্যা সমাধানে শান্তিপূর্ণ পন্থা অবলম্বনের প্রস্তাবনা আনতে বাধ্য হয়। জাতির বৃহত্তর স্বার্থকে স্মরন রেখে রাজনীতিতে সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার খাতিরে এবং অতীতের সমস্ত ভুল মুছে ফেলে আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করার জন্য ক্ষমাশীল আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পার্টি সেই বিভেদ পন্থীদের সাথে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের ব্যবস্থা করে। এর ফলশ্রুতিতে সারা দেশে এবং কর্মী বাহিনীর মধ্যে পূর্ণ শান্তি বিরাজের এক আভাস দেখা দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হলো? "খাল কেটে কুমীর আনার" দশায় পড়তে হলো। মতের যেখানে মিল

নেই, মনের মিল কি করে সম্ভব? সমান্তরাল সরলরেখা সমদূরত্ব রেখেই তো এগিয়ে চলে। এ ক্ষেত্রেও তাই। শান্তি চুক্তির সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে ১০ই নভেম্বর ১৯৮৩ সালে ষড়যন্ত্রমূলক অতর্কিত সশস্ত্র হামলা চালিয়ে পার্টির প্রতিষ্ঠাতা জুম্ম জাতির জাগরণের অগ্রদূত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে, শুভেন্দু লারমা, পরিমল বিকাশ চাকমা, অর্পনাচরণ চাকমা, মনিময় দেওয়ান, বল্যানময় খীসা, সৌমিত্র চাকমা অমর কান্তি চাকমা ও অর্জুন ত্রিপুরা সহ অমানুষিকভাবে হত্যা করে জুম্ম জাতির আন্দোলনের ইতিহাসে এই দিনটি সবচেয়ে মর্মান্তিক এবং শোকময় দিন হিসেবে স্মৃতি বহন করবে। জড়তাগ্রস্থ জুম্ম জনগণের আকুল আবেদনেও তাদের স্থবির অস্থিত্ব বিন্দুমাত্র কাম্পিত হলো না। গড়ে তুললো এক ভয়াবহ পরিবেশ যা সভ্য সমাজে এক চরম কলঙ্ক।

বর্বরোচিত হামলার এই দিনটির কথা মনে পড়লেই মনটা গভীর বেদনা বোধে ভরে উঠে। যিনি নিরাশায় নিমজ্জিত জুম্ম জাতির মনে আলো সঞ্চার করেছিলেন। নিজস্ব সমস্ত স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়ে কঠোর ত্যাগ স্বীকার করে জাতি ও মাতৃভূমিকে রক্ষা করার দীপ্ত ও বজ্র কঠোর শপথে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহান পার্টি " জন সংহতি সমিতি " তাঁর অবদানের প্রতি এই বুঝি কৃতজ্ঞতা স্বীকার? যেই দেশের মানুষ এখনও আমাদের " সংখ্যালঘু জাতি " বলে মেনে না নিয়ে কয়েক শতাব্দী আগেকার শাসক গোষ্ঠীর চাপিয়ে দেয়া অবজ্ঞামূলক পরিচয় " উপজাতি " বলে মনে করে সেই দেশে তাঁর মত সৃজনশীল প্রতিভা সম্পন্ন নেতার আবির্ভাব না ঘটলে এই জুম্ম জনগোষ্ঠী সেই উগ্র বাঙ্গালী মুসলমান জাতীয়তাবাদের কাছে বিলিন হয়ে যেত এটা খুবই বাস্তব।

বিরামহীন ঘুরছে প্রগতির চাকা। জীবন হচ্ছে দ্রুত থেকে দ্রুততর এগিয়ে চলছে পৃথিবী অবিরত। যুগের সাথে পাল্লা দিয়ে অবলা নারী পুরুষের সাথে প্রগতির নব দিগন্তে দৃপ্ত পদক্ষেপ রাখছে। ভাঙছে সংস্কারের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। পশ্চিমী হাওয়ার ছোঁয়ায় যুগের প্রয়োজনে বাঁচার তাগিদে পুরুষের কর্মক্ষেত্রের পাশাপাশি নারীরা ও সংগ্রামে নেমেছে তাই আজ ঘরে বাইরে এমন কি রাজনীতিতেও তারা আর পিছিয়ে নেই। সেই সূত্র ধরে জুম্ম নারী সমাজকে অগ্রগতির শিখরে টেনে আনার জন্য এবং আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকার যথার্থ মূল্য বোধ বিবেচনা করে প্রয়াত নেতা "পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি" গড়ে তুলেছিলেন। বিভিন্ন মহল থেকে হয়তো বিস্তর প্রশ্নও উঠেছিল। দুঃসহ কষ্টকে মেনে নিয়েও যেখানে পুরুষেরা ঠিকমত কাজ করতে পারছে না, সেখানে মহিলাদের অংশ গ্রহণ কী করে সম্ভব? কিন্তু জুম্ম নারী সমাজের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রয়াত নেতার চিন্তাধারা ছিল প্রগতিশীল, স্বচ্ছ ও সুদূর প্রসারী। তাই তাঁর একান্ত দূরদর্শিতার ও যোগ্যতায় মহিলা সমিতির কাজ যথারীতি এগিয়ে চলে — জুম্ম নারী সমাজের ঘুম ভেঙ্গে আর আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার সংগ্রামে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহন করতে এগিয়ে আসে। জাতি গঠনে নারী সমাজ সহায়ক শক্তির স্বীকৃতি আদায়ে সমর্থ হয়ে উঠে।

প্রিয় নেতা মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা আজ আর আমাদের মাঝে নেই। দেহপট সনে নট সকলি হারায়, কিন্তু দেহাবসানের পরও নেতা কিছুই হারায়নি। তাঁর কায়া ভস্মে বিলীন, কিন্তু ছায়া মুক্তিকামী জনগণের কাছে আজও অমলিন। তাঁর নীতি ও আদর্শ ক্ষুরধার মনীষা আন্দোলনে চির ভাস্কর হয়ে থাকবে। তাই নেতাকে হারানো-শোকে মুষড়ে না পড়ে তারই স্বপ্ন সৌধ আত্মনিয়ন্ত্রন অধিকার আদায়ের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী শত্রুদের বিষ দাঁত ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে হবে।

আপন প্রাপ্য না পেয়েও তিনি আপন গৌরবে জীবনকে ধন্য করেছেন, মৃত্যুর অন্তরে প্রবেশ করে খুঁজে নিতে পেরেছেন অমৃত। মরণ সাগর পারে তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী। পার্বত্য চট্টগ্রামের লাখো লাখো মানুষের মুক্তির দিশারী। আমি তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি ও সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি তাঁর মহান অবদান ও কীর্তিকে।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যা
ও
মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা

—শ্রীঅনুপ

সমস্যার উৎপত্তি, বিকাশ, বিকাশের গতিধারা ও তার সম্পর্ক ইত্যাদি নিখুঁত বিচার বিশ্লেষণ ব্যতিত সমস্যার সঠিক সমাধানের পথ পাওয়া যায়না। এ নিয়মের ব্যতিক্রম করে কোন সমস্যার বাস্তব সম্মত সমাধান হয়না, হতেও পারে না। বরং সমস্যা আরো বাড়ে, এবং জটিল আকার ধারণ করে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা ও শাসকগোষ্ঠি নিজেদের স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে খেয়াল খুশীমত সমাধান করার চেষ্টা করেছে। ফলে সমস্যার কোন সমাধান হয়নি বরং বেড়েছে ও জটিল আকার ধারণ করেছে। সেজন্য দায়ী অতীত ও বর্তমানের শাসকগোষ্ঠি।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ছিল স্বাধীন রাজ্য। তারপর বৃটিশ সাম্রাজ্যের করায়ত্ব হয় এবং ক্রমে ক্রমে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশ পরিণত হয়। ভারত পাকিস্থান বিভক্তির সময় পার্ব্বত্য চট্টগ্রামকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থানের একটি জেলা হিসাবে সংযুক্ত করা হয়। পূর্ব পাকিস্থান পরিণত হলো বাংলাদেশে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পরিণত হলো বাংলাদেশের অংশরূপে। বাংলাদেশ সরকার পার্ব্বত্য চট্টগ্রামকে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবন জেলায় পরিণত করলো।

এ পর্যন্ত পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে সমাধানের সময় পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের স্বার্থের দিকে কেউ নজর রাখেনি বা নজর রাখার চেষ্টা ও করেনি। সব সরকারই তার শাসন-শোষণের কথা স্মরণ করেই পার্বত্য চট্টগ্রামকে শাসন করেছে। সেহেতু সকল সরকারই ছিল জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন ও গণবিরোধী সরকার। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ পেয়েছে সরকার ও জনগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ পার্ব্বত্য চট্টগ্রামকে দখল করার পর জনগণের স্বার্থের কথা উপেক্ষা করে, গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি প্রবর্তন না করে, সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থাকে তাদের সুবিধানুসারে সাজিয়ে আরো পাকাপোক্ত করে। তাদের শাসন শোষণের সুবিধার্থে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামকে মং সার্কেল, বোমাং সার্কেল ও চাকমা সার্কেলে পরিণত করে এবং পৃথক এলাকা হিসাবে বাংলার গভর্ণরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে শাসন পরিচালনা করে।

ভারত পাকিস্থান বিভক্তির সময় পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম অমুসলমান অধ্যুসিত এলাকা হওয়া সত্ত্বেও কোন এক অজ্ঞাত কারণে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্থানের সাথে সংযুক্ত করা হয়। পাকিস্থান সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে পাকিস্থান সরকার পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের পুলিশ বাহিনী ভেঙ্গে দেয়। তারপর পঞ্চাশ দশকের প্রারম্ভেই পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের নানিয়াচড়, ও লংগদু থানায় কয়েক হাজার বাঙ্গালী মুসলিম পরিবার পুনর্বাসিত করে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ তোলে প্রতিবাদ।

পাকিস্থান সরকার পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে বাঙ্গালী মুসলিম পরিবার পুনর্বাসন কর্মসূচী সাময়িকভাবে বন্ধ রাখে। কিন্তু পুনর্বাসিত বাঙ্গালী মুসলমান পরিবারদের আর ফিরিয়ে নেয়নি। ১৯৫২ সালে শিল্পায়ণের নামে কর্ণফুলি নদীর কাপ্তাইয়ে পাকিস্থান সরকার এক বাঁধ দেয়া আরম্ভ করে, তা সমাপ্ত হয় ১৯৬০ সনে। জলমগ্ন হলো ২৫৩ বর্গ মাইল এলাকা ৫৭,০০০ একর উর্বর জমিসহ ডুবে গেল সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। লক্ষাধিক লোক হলো উদ্বাস্তু। পুনর্বাসনের কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয় হয়নি। কোন উপায়ান্তর না দেখে প্রায় বাট হাজার জুম্ম জনগণ সীমান্ত পাড়ি জমালে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও বার্মায়। ঢোল্ড পুরুষের বাস্তুভিটা হারা নিরীহ পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের অশ্রুজল ফেলা করুণ ক্রন্দন ও দীর্ঘশ্বাস দুনিয়ার কেউ শুনলোনা, কেউ জানলনা। বিপরীত শংখ নদীতে বাঁধ দিলে কোন ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই পাওয়া যেতো জলবিদ্যুৎ, হতো শিল্পায়ণের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত। মূলতঃ পাকিস্থান সরকারের আসল লক্ষ্য ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে পাহাড়ী জুম্মদের সমূলে উৎপাত করা।

এরপর পরবর্তী ঘটনা আরো করুণ ও বেদনাদায়ক। ১৯৬৩ সনে পাকিস্থান জাতীয় পরিষদে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের আলাদা অস্তিত্বের মর্যাদা তুলে দেয়া হলো সাংবিধানিক রীতিনীতিকে উপেক্ষা করে এবং পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের জনমতকে বৃদ্ধাঙ্গুলে প্রদর্শন করে। তারপর বাঙ্গালী মুসলমান অনুপ্রবেশ ঘটালো তৎকালীন পাকিস্থান সরকার। পাকিস্থানের শেষদিক পর্যন্ত প্রায় সোয়ালাখ বাঙ্গালী মুসলমান অনুপ্রবেশ ঘটানো হলো পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের ফেণী উপত্যকা সহ অন্যান্য অংশেও।

পাকিস্থান ভেঙ্গে গেল, জন্ম হলো বাংলাদেশ। এ রাজনৈতিক

পট পরিবর্তনে জুম্ম জনগণ আশা করেছিল এবার তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে। এ আশায় তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু ফল হলো উল্টো। এ রাজনৈতিক পট পরিবর্তন পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের হলো ঘোরতর অভিশাপ। তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার সাংবিধানিক ভাবে পরিণত করলো সকল পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম তথা বাঙ্গালী জাতিতে। সংসদের ভিতরে ও বাইরে প্রতিবাদের ঝড় তোলেন গণপরিষদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার কোন কিছু তোয়াক্কা করলেন না। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান রাঙ্গামাটীতে প্রকাশ্যে জনসভায় দাঁড়িয়ে দম্ভ করে ঘোষণা করলেন— বাংলাদেশে যারা বাস করবে সবাই বাঙ্গালী। জুম্ম জনগণ হলো বিক্ষুব্ধ।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ছত্রছায়ায় থেকে বাঙ্গালী মুসলমানেরা পশ্চাদপদ জুম্ম জাতিদের দৃষ্টির অগোচরে দখল করে নিল পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো। প্রশাসন যন্ত্রের সকল নাটবল্টুতে ব্যবসা বানিজ্য ও হাটে বাজারে ঢুকে পড়েছে বাঙ্গালী মুসলমানেরা। প্রশাসন যন্ত্রের ক্ষমতা ব্যবহার করে নিষ্ঠুরতম শাসন-শোষন আসছিল অবলীলাক্রমে। কিন্তু এতেও পাকিস্থান ও বাংলাদেশের শাসক ও শোষক গোষ্ঠি হতে পারেনি সন্তুষ্ট। পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, উর্বর ও নয়নাভিরাম উপত্যকা সমূহকে তাকালো হায়নার দৃষ্টিতে। এ অমুসলমান অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলমান অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিণত করার ষড়যন্ত্র চললো একটার পর একটা। সে সব ষড়যন্ত্রের রূপ আজ পার্বত্য চট্টগ্রামে চার লক্ষাধিক অনুপ্রবেশকারী বাঙ্গালী মুসলমান। বৃটিশ, পাকিস্থান ও বাংলাদেশ সরকার কোন সময়ই পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মজনগণের স্বার্থ রক্ষা করার দিকে কোন লক্ষ্য করেনি। শুধু শাসন, শোষন ও নির্যাতনের মাধ্যমেই শাসন করেছে এ পার্বত্য চট্টগ্রাম। পাকিস্থান ও বাংলাদেশ শাসক গোষ্ঠির অন্যতম ঘৃণ্য পরিকল্পনা হলো জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলমান অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিণত করা। পাকিস্থান সরকার যে কাজ করতে সাহস করেনি, বাংলাদেশ শাসকগোষ্ঠি উলংগ ও ন্যাকার জনকভাবে কোন কিছুকে তোয়াক্কা না করে সামরিক বাহিনীর সহযোগীতায় লাখ লাখ বাংলাদেশের ছিন্নমূল মুসলমানকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগনের জায়গা-জমি বেদখল করে পুনর্বাসন করে যাচ্ছে দ্রুতগতিতে। আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল সমস্যা হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মজনগন চায় তাঁদের প্রিয় মাতৃভূমির অস্তিত্ব ও জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রন অধিকার অপরদিকে বাংলাদেশের শাসক গোষ্ঠি চায় ছলে-বলে কৌশলে যে কোন প্রকারেই হোক পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মজনগণকে উৎখাত করে বাঙ্গালী মুসলমান অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিণত করা। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠি ষড়যন্ত্রের পর ষড়যন্ত্র, অত্যাচার, নির্যাতন, জমিবেদখল, জেল জুলুম ইত্যাদি চালিয়ে যাচ্ছে।

অপরদিকে এসব ষড়যন্ত্র, অত্যাচার, নির্যাতন, ভূমি বেদখল জেল জুলুম ইত্যাদি জন্ম দিল পার্বত্য চট্টগ্রামের কৃতি সন্তান চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ, মহান অগ্রনায়ক, জনদরদী, দেশপ্রেমিক, নিরীহ দুঃখী মানুষের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু, অপ্রতিদ্বন্দ্বি জননেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মাকে। জন্ম দিল পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের প্রাণপ্রিয় একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন "পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকে"। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে শুরু হলো দুর্বার জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রন অধিকার আন্দোলন। জন্ম নিল পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে পরিচালিত সশস্ত্র দল "শান্তিবাহিনী"। শুরু হলে সশস্ত্র আন্দোলন প্রয়াতনেতা মানবেন্দ্র নারায়ন লার্মার নেতৃত্বে পরিচালিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্রদল শান্তিবাহিনী কতৃক। পার্বত্য চট্টগ্রামের কৃতিসন্তান চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ, মহান অগ্রনায়ক, বিপ্লবী কণ্ঠস্বর দুঃখীনিরীহ মানুষের ঘনিষ্টতম বন্ধু মানবেন্দ্র নারায়ন লার্মা জীবনের সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে পরিহার করে; সাধু সন্যাসীর ন্যায় জীবন যাপন করে, কঠোর নিয়ম নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে, গভীর জঙ্গলে শত্রুর দৃষ্টির আড়ালে থেকে, অসীম ধৈর্য্য, সাহস ও অটুট মনোবলে বলীয়ান হয়ে পরিচালনা করতে লাগলেন সশস্ত্র আন্দোলন, সকল ষড়যন্ত্র, অত্যাচার, নির্যাতন, শাসন, শোষন, ভূমিবেদখল, জেল জুলুম ইত্যাদি দুর করে পার্বত্য চট্টগ্রামের আত্মনিয়ন্ত্রন অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদী. উগ্র ধর্মান্ধ, জাত্যাভিমানী বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে। পার্টির রাজনৈতিক ও সামরিক সংগঠনকে আরো অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যক্রম করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত। তাঁর ছিল প্রগার আত্মবিশ্বাস ও অটুট মনোবল।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা ছিলেন ভদ্র, নম্র, বিনয়ী, স্বল্পভাষী স্বভাবের মানুষ। তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছিলেন প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। যার কারণে তিনি ছাত্র অবস্থায় দুই বৎসরের অধিক সময় পর্যন্ত কারাজীবন ভোগ করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন কঠোর সংযমী। জীবনের সব কিছুতেই তিনি কঠোর নিয়ম মেনে চলতেন। ধর্মীয় রীতি মেনে চলতেন যথারীতি। তিনি ছিলেন সৃষ্টিশীল মেধা ও তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির অধিকারী। দয়া ও ক্ষমাশীলতায় তিনি ছিলেন সর্বজনবিদিত। তাঁর সবকিছুতেই ছিল একটা অসাধারণত্বের ছাপ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা ও সমাধানের জন্য তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি স্বচক্ষে এবং অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছেন পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের সমস্যা। পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন,

অধ্যয়ণ করেছেন এবং চুলচেড়া বিশ্লেষণও করেছেন তিনি। তিনিই জাগিয়ে তুলেছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘুমন্ত জুম্ম জনগণকে আত্মনিয়ন্ত্রন অধিকার আদায়ের সংগ্রামে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বুদ্ধিজীবি, ছাত্রসমাজ ও সমাজের সকলস্তরের জনগণের সাথে আলাপ আলোচনা করেছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে। তিনি তৎকালীন পাকিস্থান ও বাংলাদেশের বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী, মধ্যপন্থী সকল রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা ও তার সমাধান সম্প বিস্তারিত ও বহুবার আলোচনা চালিয়েছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যাকে দু'একজন ব্যতিত কেউ অন্তরদিয়ে উপলব্ধি করেন নি। প্রায় সকলেই নিজ-নিজ দলীয় স্বার্থের গণ্ডীর মধ্যে সমস্যাকে স্বীকার করতেন। তাঁর জীবদ্দশায় আলাপ প্রসঙ্গে আক্ষেপ করে প্রায়ই বলতেন তৎকালীন পাকিস্থান বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যার উপেক্ষামূলক কথা ও আচরণ। কৃতজ্ঞতা ভরে স্মরণ করতেন দু'একজন রাজনীতিকের কথাও। উক্ত রাজনীতিবিদেরা শুধু চেয়েছিলেন, তাঁকে ব্যবহার করে পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের নিজ নিজ দলীয় শাখা গঠন করতে। কিন্তু তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল রাজনৈতিক সমস্যাকে বাদ দিয়ে কোন ধরণের রাজনীতি করতে রাজী ছিলেন না। স্বার্থের রাজনীতির তিনি ছিলেন বিরোধী। তিনিই পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র সমিতিকে ষাট দশকে জোরদার করেছিলেন। ১৯৭০ সনে পাকিস্থানের শেষ নির্বাচনে তিনি বিপুল ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্থান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হিসাবে। তখন সমস্ত পূর্ব পাকিস্থান ব্যাপী আওয়ামীলীগের জনপ্রিয়তার জোয়ার বইতেছিল। আওয়ামীলীগকে তিনিই শুরু করে দিয়েছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামে। তারপর ১৯৭২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের সমস্যাকে ভিত্তি করে গড়ে তোলেন "পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি"। ১৯৭৩ সনে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর প্রথম নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সমর্থনে বিপুল ভোট পেয়ে পুনঃনির্বাচিত হন বাংলাদেশ সংসদ সদস্য হিসাবে। সংসদ সদস্য হিসাবে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যার নিরসন কল্পে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্ব শাসন সহ বহু দাবী দাওয়া উত্থাপন করেছিলেন। আওয়ামীলীগ সরকার তা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে। বিপরীতে আওয়ামীলীগ সরকার তাঁকে মন্ত্রীত্বপদ গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। যাতে তিনি আর পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্ব শাসনের দাবী সহ অন্যান্য দাবী না করেন। আওয়ামীলীগ সরকারের সেই প্রস্তাব তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেন। বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্ব শাসনের দাবী দমিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের দীঘিনালা, আলীকদম ও রুমায় তিনটি সেনানিবাস স্থাপন করে। এতদসত্বেও তিনি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যাকে সমাধান করার জন্য আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। শেষ অবধি বাংলাদেশ সরকার জনসংহতি সমিতিকে নিষিদ্ধ করে দেয়। তখন তিনি বাধ্য হন নিয়মতান্ত্রিক পথ বাদ দিয়ে সশস্ত্র আন্দোলনের পথ বেছে নিতে।

পার্টির প্রায় সকল নীতি নির্ধারণী দলিল পত্রাদি তিনি নিজেই প্রণয়ণ করতেন তাঁর বাস্তব নীতি কৌশলের জোরে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে এক শক্তিশালী রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। তাঁর প্রতিটি ব্যাপারে ছিল নিখুঁত বিচার বিশ্লেষন। সাংগঠনিক দক্ষতা ছিল অসাধারণ। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি পার্টির সশস্ত্র শাখাকে সুসংগঠিত করেন। ১৯৭৬ সনে শুরু হলো সশস্ত্র আন্দোলন। তখন সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সরকারের শাসনযন্ত্র প্রায় বিকল হয়ে যায়। বাংলাদেশ সরকার হয়ে উঠলো ব্যতিব্যস্ত। ১৯৭৭ সনে চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার জনাব আবদুল আউয়াল রাঙামাটীতে প্রকাশ্যে জনসভায় দাঁড়িয়ে রাগের বশে সরকারের গোপন উদ্দেশ্য বেমালুম ফাঁস করে বলেছিলেন বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ চায় না, চায় পার্বত্য চট্টগ্রামের মাটি। এতে জুম্ম জনসাধারণের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হলো।

একদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি যখন তার বৈপ্লবিক কর্মসূচী অনুসারে অগ্রসর হচ্ছে, অপরদিকে জনসংহতি সমিতিকে জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন বা জুম্ম জনগণকে দ্বিধাবিভক্ত করার জন্য সৃষ্টি করে দিলো প্রতিক্রিয়াশীল ও সরকারী দালাল সংস্থা "ট্রাইবেল কনভেনশন"। বাংলাদেশ সরকার ট্রাইবেল কনভেনশনে পাহাড়ী নেতা "উপাধি" প্রদান করে কতিপয় সুবিধাবাদী জুম্মকে একত্রিত করলেন। বাংলাদেশ সরকারের উপাধিপ্রাপ্ত তথাকথিত পাহাড়ী নেতাদের জুম্ম জনগণ নাম দিলেন "তুল"। ট্রাইবেল কনভেনশনের অপর নাম হলো "তুলা কনভেনশন"। ঐ ট্রাইবেল কনভেনশনকে পরিচালনা করত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। ট্রাইবেল কনভেনশনের জনসভায় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের অবশ্যই উপস্থিত হতে হতো। সভায় উপস্থিত না হলে বেতন বন্ধ হতো, বলা হতো শান্তিবাহিনী সমর্থক, দুষ্কৃতিকারী। হেডম্যান, কার্বারী মেম্বারদেরও জনসভায় যোগদান করতে হতো বাধ্যতামূলকভাবে। তা না হলে আখ্যায়িত করতো দুষ্কৃতিকারী, হতে হতো জেলজুলুমের স্বীকার। আশে পাশে গ্রামগুলোতে গিয়ে সেনাবাহিনী গ্রাম ঘেরা করে জনসাধারণকে উপস্থিত করা হতো জনসভায়। সেসব জনসভায় উক্ত উপাধিপ্রাপ্ত পাহাড়ী নেতারা বাংলাদেশ সরকারের গুনগান করতো পিঞ্জিরাবদ্ধ টিয়া পাখীর মত এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতো জুম্মজনগণের প্রাণপ্রিয় নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মাকে। এবং জনসংহতি সমিতির কার্যক্রমকে রাষ্ট্রবিরোধী বলে সমালোচনা করতো। উক্ত জনসভায় উপস্থিত হতেন বড় বড় সামরিক কর্মকর্তারা, দিতেন বক্তৃতা—উচ্চারণ

করতেন হুঁশিয়ারী ও হুমকি, নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিতেন শান্তি বাহিনী-দের ভাত দেয়া ও চাঁদা দেয়া, দিতেন উন্নয়নের লম্বা লম্বা ফিরিস্তি দোষারোপ করতেন অতীতের শাসকগোষ্ঠিকে; কথার ফুলঝুড়িতে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামকে বানাতেন স্বর্গ। শান্তিবাহিনীকে ভাত দেয়া, চাঁদা দেয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিয়ে জনসংহতি সমিতির বিকল্প রাজনৈতিক সংগঠন দাঁড় করানোর ব্যর্থ প্রয়াস চালানো হয়। কিন্তু জুম্মজনগণ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন ট্রাইবেল কনভেনশনকে। প্রমাণিত হলো জনগণের স্বার্থকে বাদ দিয়ে কোন রাজনীতিই হতে পারেনা।

এরপর গঠন করা হলো পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নবোর্ড। উপরের আবরণে বলা হলো, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম অর্থনৈতিক ভাবে পশ্চাদপদ; সদাশয় সামরিক সরকার পার্ব্বত্য চট্টগ্রামকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। উন্নয়ন বোর্ডের গোপন উদ্দেশ্য হলো সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনে রাস্তাঘাট প্রস্তুত করা ও বাংলাদেশের অন্যান্য জেলা হতে আনা বাঙ্গালী মুসলমানদের পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে পুণর্বাসন দেয়া। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রসারের নামে একটি রাস্তা প্রস্তুত করলো দীঘিনালা সেনাশিবির হতে বাঘের হাট সেনাশিবির পর্যন্ত দীর্ঘ রাস্তা। সে রাস্তায় সেনাবাহিনীর গাড়ী ব্যতীত অন্য কোন গাড়ী বা জনসাধারণ যাতায়ত করেনা ঐ রাস্তা দিয়ে। যাতায়তের প্রয়োজনও হয়না। ঐ এলাকা জনমানব শূন্য। সে রাস্তা জনগণের ব্যবহারের প্রশ্নই উঠে না।

পরবর্তী পদক্ষেপ তথাকথিত আদর্শ গ্রাম ও যুক্ত গ্রাম। সামরিক বাহিনী জনগণের চৌদ্দপুরুষের গ্রামগুলো ভেঙে দিয়ে জোর করে নিয়ে আসে এক জায়গায় একত্রিত করে অনেক গ্রামের লোকজন। নাম দেয় আদর্শ গ্রাম। সে আদর্শ গ্রামে থাকে একটি সামরিক বাহিনী ক্যাম্প। জনসাধারণ সে আদর্শ গ্রাম হতে সেনাবাহিনীর অনুমতি ব্যতিরেকে কোথাও যেতে পারে না। সকাল বিকাল গ্রামবাসীদের গনণা করা হয়। এ সব স্মরণ করিয়ে দেয় হিটলারের **Concentration Camp** কে। সরকারের উদ্দেশ্য হলো যেন-তেন প্রকারে হলেও জনসংহতি সমিতিকে জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন করা।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে সরকারী সেনাবাহিনীর অত্যাচার নির্যাতন একটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় দাঁড়িয়েছে। যখন ইচ্ছা গ্রাম ঘেরাও করা, গ্রাম জালিয়ে দেয়া, লুটপাত হত্যাকাণ্ড, মা-বোন বেইজ্জত। যখন তখন যাকে তাকে গ্রেপ্তার মারপিট ইত্যাদি পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থানরত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তথাকথিত পবিত্রতম দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য।

অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে আজ অবধি। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদির সরবরাহ বন্ধ। যা পাওয়া যায় সীমিত পরিমানে কল্পনাতীত চড়ামূল্যে। এ সবই কি বাংলাদেশ সরকারের পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টার নজির? জুম্ম জনগণ বুঝতে পেরেছে বাংলাদেশ সরকার জুম্ম জনগণের সরকার নয়, শত্রু। এসব নিষ্ঠুরতম কাজের দ্বারা বাংলাদেশ সরকার জনগণ হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং পুরো গণবিরোধী সরকারে পরিণত হয়েছে।

বাঙ্গালী মুসলমান অনুপ্রবেশ পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহায়তায় নিরন্তর ঘটছে। দিন দিন ভূমি বেদখল হচ্ছে ব্যাপক ভাবে। জুম্ম জনগণ বাঙ্গালী মুসলমান অনুপ্রবেশের ঘটনা সহ বিভিন্ন ষড়যন্ত্রমূলক পদক্ষেপের উদ্দেশ্য পরিস্কার ভাবে বুঝতে পেরেছে। পার্টির জনসমর্থন ব্যাপকহারে বেড়েছে সরকারের এ ষড়যন্ত্রমূলক পদক্ষেপের কারণে। বাঙ্গালী অনুপ্রবেশ ব্যতীত জুম্ম জনগণ বাংলাদেশ সরকারের সকল পদক্ষেপ বানচাল করতে সমর্থ হয়েছে। আন্দোলনের চেহারা পাল্টাবার সময় হয়েছিল পরিপক্ক। পার্টি ও প্রস্তুত, জনগণও প্রস্তুত।

ঠিক এমনি এক মুহূর্তে এক শ্রেণীর কতিপয় নিষ্ক্রিয়, দুর্নীতি পরায়ণ উদ্যোগহীন, ক্ষমতালোভী ও উচ্চাভিলাষী নেতৃস্থানীয় কর্মী শ্লোগানে তুললো 'লাম্বা-বাদী" (দীর্ঘস্থায়ী ও দ্রুত নিষ্পত্তি)। নিজেদের তারা পরিচয় দিলো বাদী বলে। পার্টি নেতার বিরুদ্ধে নানা ধরণের কুৎসা রটনা করতে লাগলো। তিন মাসে দেশ স্বাধীন করার আশ্বাস দিলো জনগণ ও কর্মী বাহিনীকে। বলতে লাগলো তথাকথিত বৈদেশিক সাহায্য এনে করবে তারা দেশ স্বাধীন। পার্টি নেতার দুনিয়ার কোনখানে বন্ধুও নেই সম্পর্কও নেই ইসরাইল ও দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের টাকা দেবে অঢেল। এভাবে নানা ধরণের অপপ্রচারণা চালাতে লাগলো। হলো জাতীয় সম্মেলন। কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনে হলো নির্বাচন। নির্বাচনে পরাজিত হলো তথাকথিত বাদীরা। তার পর গণতান্ত্রিক পথ ছেড়ে অগণতান্ত্রিক ও ষড়যন্ত্রের পথ ধরলো তারা। গোপনে গোপনে তারা আলাদা পার্টি আলাদা সেনাবাহিনী গঠন করে শপথ গ্রহন করে। ভুল বোঝাবুঝির অবসানের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক আহ্বান করা হয়। বৈঠকে উপস্থিত হতে সম্মত হলেও তারা নানা তালবাহানা করে গোপনে গোপনে সামরিক প্রস্তুতি চালায়। পার্টির কেন্দ্রীয় অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরিয়ে নিতে থাকে। এভাবে তারা শান্তিপূর্ণ আলোচনার পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়। শেষ পর্যন্ত সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। মূলতঃ ঐ সমস্ত কর্মীরা আন্দোলনের কাঠিন্যকে পাশ কাটিয়ে, নিজেদের পরিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে অক্ষুন্ন রেখে, শত্রুর বাহিনীকে ভয়ে, শত্রুর সাথে গোপন দিতালি পাতিয়ে আর নিজেদের দুর্বলতা ও দুর্নীতিকে আড়াল করার উদ্দেশ্যে ক্ষমতালোভী হয়ে চক্রান্তমূলক এক অতর্কিত আক্রমন চালিয়ে ১০ই নভেম্বর ১৯৮৩ ইং পার্টির নেতাকে হত্যা করে। পার্টির ক্ষমতা দখল করে আন্দোলনকে চিরকালের জন্য বন্ধ করে দিতে চায়। দুনিয়ার কোন সাহায্য সহযোগীতার ক্ষেত্রে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করা।

দিন যতই গড়াচ্ছে কয়েকটি বিষয় জনগণের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। দলীয় আভ্যন্তরীন সংঘর্ষ শুরু হবার পর হতে রাঙ্গামাটিতে অবস্থানরত বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক উপাধিপ্রাপ্ত তথাকথিত পাহাড়ী নেতা প্রকাশ্যে চক্রান্তকারীদের সমর্থনে নানা অপপ্রচার চালাচ্ছে পার্টি ও পার্টি নেতার বিরুদ্ধে। দেখা গেল বাংলাদেশ সেনাবাহিনী চোখ বন্ধ করে আছে। রাঙ্গামাটিতে সে প্রকাশ্যে বলে বেড়ায় যে হত্যাকারী বাদিদের বিশ্বের নানাদেশ সাহায্য সহযোগীতা দিচ্ছে। তিন মাসে দেশ স্বাধীন হচ্ছে। অপর দিকে পার্টির অনুকূলে কেউ কোন সত্য কথাও বলতে পারেনা না। সেই উপাধিপ্রাপ্ত পাহাড়ী নেতার বাংলাদেশ সরকার এর সাথে দহরম-মহরম করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক আহুত জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছে সরকারী যানবাহনে চড়ে। জনমনে প্রশ্ন দেখা দিল এ কিসের আলামত? এটাও কি একটা নজীর বিহীন দৃষ্টান্ত নয়? এর গোপন রহস্য কি?

অপরদিকে আর এক রহস্য। গুপ্তচর বিভাগের খ্যাতনামা এজেন্ট ?। বনভূমি ও গিরিদর্পন পত্রিকার সম্পাদক তার পত্রিকাগুলোকে পরিণত করেছে চক্রান্তকারী, বিভেদপন্থী, বিশ্বাস-ঘাতকদের মুখপত্র রূপে। জনগণের ধারণা, সম্মানিত সম্পাদকের পত্রিকাগুলো বিভেদপন্থীদের পোষ্টার রূপেই কাজ করছে। পার্টি সম্পর্কে আজগুবি, মিথ্যা, ভিত্তিহীন খবরাখবর ছাপিয়ে চক্রান্তকারী-দের উলঙ্গভাবে সমর্থন জানাচ্ছে। বনভূমি ও গিরিদর্পন এ ৯৫% ভাগ মিথ্যা খবর ছাপিয়ে কি চক্রান্তকারীদের সমর্থন দিচ্ছে না? এসব মিথ্যা খবরের উদ্দেশ্যই বা কি? এর মধ্যে কি কোন রহস্য নেই? জনগণের প্রশ্ন পত্রিকাগুলো কিভাবে ও কেন চক্রান্তকারীদের পোষ্টারে পরিণত হলো?

জুম্ম জাতি ও পার্টি তার মহান নেতাকে হারালেও তাঁর অনুসৃত নীতিকে হারায়নি। বাংলাদেশ সরকার ও তার দোসর মীরজাফর চক্র ভেবেছিল পার্টির নেতাকে হত্যা করতে পারলে আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার বানচাল হবে। বাংলাদেশ সরকার বিনাবাধায় অমুসলমান অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলমান অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিণত করতে পারবে। মীরজাফর চক্র মনে করেছিল, পার্বত্য চট্টগ্রামে তারাই হবে জুম্ম জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী নেতা ও পার্টি। বস্তুতঃ তা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের বীর জুম্ম জনগণ ও পার্টির ব্যাপক কর্মী বাহিনী বাংলাদেশ সরকার ও মীরজাফর চক্রের ষড়যন্ত্র বানচাল করতে সমর্থ হয়েছেন। পার্টি ও জনগণ এখন আরও ঐক্যবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ হতে পেরেছে। পার্টি ও জনগণ আরো এগিয়ে যাচ্ছে সামনে সব ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিয়ে, এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের মূল উদ্দেশ্য অমুসলমান অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলমান অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিণত করার পরিকল্পনাকে বানচাল করে দিবে জুম্ম জনগণের বাঁচার অধিকার "আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার" আন্দোলন জোরদার করার জন্য দৃপ্ত পদক্ষেপে নূতন বলিষ্ট নেতৃত্বে ও বাস্তব সম্মত কর্মসূচী নিয়ে।

বাংলাদেশ সরকারের এ রাজনৈতিক সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবে সমাধান করার আদৌ কোন সদিচ্ছা নেই। তার উদ্দেশ্যে এ সমস্যাকে মুসলমান অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিণত করে সমাধান করা। তার অর্থ জুম্ম জনগণকে ধ্বংস করা। কিন্তু জুম্ম জনগণ আজ জাগ্রত। তাঁরা অনেক রক্তের বিনিময়ে অপূরনীয় ক্ষতি স্বীকার করে বাংলাদেশ সরকারের প্রায় সকল ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিয়েছে। এখন জুম্ম জনগণ অনেক সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ। বাংলাদেশ সরকার বাধ্য হবে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার ফিরিয়ে দিতে। এটাই হলো সঠিক ও বিজ্ঞান সম্মত সমাধান। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের মূল সমস্যা কি ও তার সমাধান কি আমাদের পার্টির প্রয়াতনেতা, এদেশের কৃতি সন্তান; চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ, মহান অগ্রনায়ক, অনদরদী দেশপ্রেমিক, দুঃখী মানুষের ঘনিষ্টতম বন্ধু, অপ্রতিদ্বন্দ্বি জননেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা ও সমাধানের পথ পরিষ্কারভাবে বাৎলে দিয়ে গেছেন।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা, শ্রদ্ধেয় দলীয় নেতা নিহত হলেও পার্টি নিহত হয়নি, নিহত হয়নি তার অনুসৃত নীতি, নিহত হয়নি পার্টির ব্যাপক কর্মী বাহিনী, নিহত হয়নি পার্টির পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ। দেশী বিদেশী সকল রকম ষড়যন্ত্রকে বানচাল করে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্মো জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আদায়ের আন্দোলনে জুম্ম জনগণ ঐক্যবদ্ধ ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মো জনগণের "আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার" আদায় হবেই হবে।

আজ ১০ই নভেম্বর ১৯৮৪ ইংরেজী শ্রদ্ধেয় নেতা, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও জাগরণের অগ্রদূতকে স্মরণ করছি শ্রদ্ধা ভরে।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা অমর হোক।

র-বান্যা ফকিরের কেরামতি

—শ্রীসুজিত

এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল কিভাবে সমাজের সহজ সরল ও নীরিহ মানুষকে প্রবঞ্চনা করে বিপাকে ফেলে সর্বনাশ ডেকে আনে এবং তার শেষ পরিণতি যে কিরকম মারাত্মক হয়ে উঠে তার একটা বাস্তব ঘটনার কথা বলছি— বিংশ শতাব্দির প্রথম দিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের লংগদু থানা এলাকার নল্লোয়া নামক স্থানে এক শিশুর জন্ম হয়। তার নাম রাখা হয়েছিল র-বান্যা। ভূমিষ্ট হবার পর থেকেই অসম্ভব কান্নাকাটি করতো বলেই শিশুটির নামকরণ করা হয় র-বান্যা। এখানেই তার নামের স্বার্থকতা।

তখনকার সময় সাধারণ মানুষ ছিল অতি সরল। দিনকালও ছিল ভাল। এক আড়ি ধানের জুমের চাষ করলে বৎসরের গোরাকী অনায়াসে চলে যায়। ছোট নদীতে মাছ কাঁকড়ার অভাব নেই। আস্তে আস্তে র-বান্যা যখন বড় হতে লাগলো গ্রামের ছেলেদের সাথে পাড়াময় ঘুরে বেড়াতো। সমবয়সীদের মধ্যে সেই ছিল সবচাইতে চালাক ও দুর্দান্ত। সারাদিন টো টো করে বেড়াতো আর পাখীর বাসা খুঁজা, গাছে গাছে নানা ফলমূল পেড়ে খাওয়াই ছিল তার কাজ। বাবা মার ছিল একমাত্র সন্তান। বাবা মায়ের ছিল আদরের দুলাল। বাবা মার একমাত্র সন্তান তাই র-বান্যা জুমের চাষ বা অন্যান্য সব কাজ হতে অব্যাহতি পেতো। বাড়ীতে বাবা মা ও ছেলে এই তিনটি প্রাণীর সংসার। এককথায় বলতে গেলে সুখের নীড়। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস একরাতে তার মা ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লো। মা জ্বরের তাপ সহ্য করতে না পেরে আবোল তাবোল প্রলাপ বকতে থাকে। তখন ভূত প্রেতের উদ্দেশ্যে অনেক পূজা বলি দিয়ে শেষ পর্যন্ত বৈদ্য, কবিরাজ ডেকেও শেষ রক্ষা হলো না। মৃত্যুর আগে মা ছেলেকে বলে গেলো— বাবা দেখিস, আর কতদিন ঘুরে ফিরে খাবি, নিজকে বাঁচাতে চেষ্টা করিস।

মা মারা যাওয়ার পর র-বান্যা একটু দুঃখে পড়ে গেল। তার বাবা তাকে কাজে সাহায্য করতে বাধ্য করতে চায়। কিন্তু আগের অভ্যাস সে কোন দিন পাল্টাতে পারেনি বা পাল্টাতেও চেষ্টা করেনি। মা মারা যাওয়ার এক বৎসর হতে না হতেই তার বাবা দ্বিতীয় বিবাহ করে বসলো। বাবার দ্বিতীয় স্ত্রী সঙ্গে তিন মেয়ে ও এক ছেলে নিয়ে আসে। ফলে সংসারের ঝামেলা স্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেলো। তার বাবা এখন তাকে কাজ করার জন্য বাধ্য করবেই। অপরদিকে তার সৎ মাও তাকে ভাল চোখে দেখে না। র-বান্যার জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠলো।

একদিন র-বান্যা ছোট নদীর ধারে এক কাঁঠাল গাছের নীচে বসে বিগত দিনগুলির কথা ভাবতে শুরু করলো। মায়ের আদর বাসনা ও গ্রামের ঘরে ঘরে গিয়ে বেশ খেয়েছি— এসব কথা ভাবতে লাগলো. কে আর তাকে খাওয়াবে, সে বড় চিন্তিত হয়ে পড়লো। সে এক বুদ্ধি বের করলো। ঠিক করলো তপস্যা করবে, জ্ঞানী গুণী হবে এলাকাবাসীরা তাকে শ্রদ্ধার সহিত দেখবে। তখন আর তার খাওয়ার চিন্তা করতে হবেনা। এরপর সে মাথার চুল লম্বা রাখতে শুরু করলো এবং এক নিরালা স্থানে ধ্যানস্থ হলো। মাথার চুল লম্বা বলে গ্রামের লোকেরা তাকে নাম দিলো র-বান্যা ফকির। সাথে সাথে কয়েকজন সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে এক ফন্দি আঁটলো। সাঙ্গ পাঙ্গদেরকে তার পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করলো। সাঙ্গপাঙ্গরাও ফকিরের পরিকল্পনাকে স্বাগত জানালো। পরিকল্পনা মাফিক হারমোনিয়াম বেহালা, তবলা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র যোগার করা হতে লাগলো। সেগুলি যোগার হয়ে গেলে কিছুদিনের মধ্যে সে ঘোষণা করলো তার ধ্যান পূর্ণ হয়েছে। এখন স্বর্গে ইন্দ্ররাজার সাথে তার যোগাযোগ হচ্ছে সাঙ্গপাঙ্গদের বললো তোমরা রাত্রে পাহাড়ের উপরে উঠে ঐ বাদ্যযন্ত্র বাজাবে। কিন্তু দেখ গ্রামের লোকে যেন তোদের টের না পায়। তার সাঙ্গপাঙ্গরা ঠিক তার কথামত সময় সুযোগ বুঝে বাদ্যযন্ত্র বাজাতো। র-বান্যা ফকির তখন থেকেই গ্রামের একটু উপরে নল্লোয়ার ধারে এক বট গাছের নীচে ধ্যানে মগ্ন থাকতো। আর গ্রামবাসীদের স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের নানা আজগুবি সংবাদ দিয়ে থাকে। সহজ, সরল নিরক্ষর গ্রামবাসীরা সত্য সত্যই ফকিরের কথা বিশ্বাস করতে লাগলো। র-বান্যা ফকিরের কেরামতি বেশ জমিয়ে উঠলো। ফলমূল টাকা পয়সা ও বিভিন্ন ধরণের জিনিষপত্রাদি দিয়ে গ্রামবাসীরা তাকে পূজা করতে শুরু করলো। এদিকে ফকিরের সাঙ্গ পাঙ্গরাও বেশ আরামে দিন কাটাতে লাগলো।

কিছুদিন পরে র-বান্যা ফকির আবার প্রচার করতে শুরু করলো যে, যাকে ইচ্ছা থাকে মরণের আগে স্বর্গে নিতে পারবে, স্বর্গের খবর বলতে লাগলো— স্বর্গে দুঃখ বলতে কিছুই নেই, মৃত্যু নেই, শুধু রঙ্গ তামাসা ও নাচ, গান, কাজ নেই, খাওয়ার খাওয়ার চিন্তা নেই। ইচ্ছা করলে সবাই পরিবার পরিজনসহ স্বর্গে যেতে পারবে তবে কতক-গুলি শর্ত মানতে হবে। যেমন—

১) ধর্মকর্ম করতে হবে;

২) দান দক্ষিণা করতে হবে;

৩) বিগত দিনের ভাল কাজ, খারাপ কাজ যেই বা করেছে সে সবই দ্বিধাহীনভাবে তার কাছে স্বীকার করতে হবে।

৭) পোষাক পরিচ্ছদ ভাল হতে হবে;

৫) আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ভাল হতে হবে যাকে বলে পবিত্র।

৮) যাবতীয় সম্পত্তি ভগবানের নামে দান করে দিতে হবে, কারণ এখানে দান না করলে স্বর্গে গিয়ে সেগুলি পাওয়া যাবেনা।

৭) সন্ন্যাসীকে একমনে ভক্তি করতে হবে।

ফকির আরো প্রচার করতে থাকে, স্বর্গে যাওয়া পুরুষের অপেক্ষা নারীদের বেশী কঠিন কাজ। কারণ আগের জন্মে পাপ করেছে বলে এই জন্মে নারী হয়েছে। পুরুষের আগের জন্মে ধর্ম কর্ম করেছে বলে পুরুষ জাতিতে জন্মগ্রহণ করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। মেয়েদের স্বর্গে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করতে হলে বটবৃক্ষে পানি ঢালা, স্বামীর প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, ভগবানের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও পূজা বেশী করে করতে হবে। বয়স্কদেরও জল তুলে সন্ন্যাসীদের স্নান করা ইত্যাদি। এর মধ্যে ফকিরের ছল চাতুরীর অভাব নেই। বুড়ী মেয়েরা জল তুলে স্নান করাবার উপযুক্ত নয়। কারণ তারা বুড়ী। যাদের ঘর সংসার আছে পরিবারের কাজ কর্ম আছে, ছেলে মেয়ে আছে তাদের পক্ষেও সম্ভব নয়। যুবতীরাই ঐ কাজে উপযুক্ত। কারণ তাদের ঘর সংসার নেই। কোন ঝামেলাও তাদের নেই। পুরুষ বা নারী পাপীরা তার ঐ স্নান করার জলে স্নান বা পান করলে পাপ মোচন হবে। এইভাবেই তার অভিনয় ভেল্কির কার্যক্রম শুরু করলো।

ফকিরের সাঙ্গপাঙ্গরা প্রতিদিন বাদ্য বাজতো। ফকিরের আস্তানায় আগত ভক্তেরাও সেই বাজনা শুনতো এবং ফকিরের কথা-মতো বিশ্বাস করতো যে, সত্যি সত্যি স্বর্গের বাজনা তারা শুনছে। এইভাবে ফকিরের প্রতি ভক্তেরা দিন দিনই আকৃষ্ট হতে থাকে। ফকিরের আর অভাব নেই। তার উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হতে চলেছে। ঐদিকে ভক্তেরা ফকিরের প্রদত্ত শর্তাবলী মেনে চলতে থাকে। স্বর্গে কে না যেতে চায়? তাও আবার মৃত্যুর পরে নয়, একেবারে জীবন্ত অবস্থায় পরিবার পরিজন নিয়ে। শুরু হলো ভক্তদের মধ্যে স্বর্গে যাওয়ার প্রতিযোগিতা। কষ্ট করে পাহাড়ের উপর ঝর্ণার জল এনে ফকিরকে স্নান করাতে লাগলো আর এই স্নান করা জল পান করে ও স্নান করে পাপীরা পাপ মোচন করতে লাগলো। গ্রামবাসীরা স্বর্গে যাবার আশায় সব কাজ ত্যাগ করলো।

সারা এলাকা জুড়ে পড়ে গেল হৈ চৈ। সেই খবর ছড়িয়ে পড়লো একগ্রাম হতে অন্যগ্রামে। ফকির দর্শনে আসতে লাগলো দূর-দূরান্ত হতে। হাতে তাদের ফকিরের প্রসাদ। মানুষের ভীড় যতই বেড়ে যেতে লাগলো, তেমনিভাবে দান দক্ষিণাও স্বাভাবিক ভাবেই বেশী আসতে শুরু হলো। গ্রামের অধিকাংশ লোক বিষয় সম্পত্তি এমনকি বীজ ধান পর্যন্ত বিক্রি করে ফকিরের নামে দান করে দিতে লাগলো। আর পরমানন্দে স্বর্গে আরোহণের অপেক্ষায় দিন কাটাতে লাগলো। এদিকে পূজা অর্চনা তথা শর্তাদি যথাযথ ভাবে পালিত হতে লাগলো।

এইভাবে দিন যায়, মাস যায়। যারা বিষয় সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছে এতোদিনে তাদের টাকা পয়সাও প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। ফকিরের কাছে গিয়ে বলে ফকির কবে স্বর্গে যাত্রা করা হবে? ফকির উত্তর দেয় আরও কিছুদিন ধর্য্য ধরো। স্বর্গ যাত্রীদের সংখ্যা আরো একটু বাড়লেই স্বর্গে পৌছে দিয়ে আসবো। এইভাবে চলতে থাকলো আরো বেশ কিছুদিন। এমনি করতে করতেই অনেকের মনে ফকিরের প্রতি সন্দেহ হতে লাগলো। মুখ তুলে কেহই বলতে পারে না; পাশে ফকির রাগ করে এবং স্বর্গে নিয়ে না যায়। কিন্তু যতই দিন গড়াতে লাগলো, ফকিরের প্রতি তত বেশী করে সন্দেহের উদ্রেক হতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত ফকিরের কাণ্ডকীর্তি সম্পর্কে লংগদু থানার দারোগা অবহিত হলো। তিনি একদিন চারজন সিপাহী নিয়ে বিষয়বস্তু জানার জন্য ফকিরের আস্তানায় গিয়ে হাজির হলেন। দারোগাবাবু যাওয়ার সময় ফকিরের জন্য প্রসাদও নিয়ে গেলেন। ফকিরের কাছে গিয়ে বললেন তিনিও তাদের সাথে স্বর্গে যেতে চান। ফকির দারোগাবাবুকে বললেন — সন্ধ্যার পরে তার কাছে যেতে, তখন স্বর্গে নাচ, গান, রঙ্গ তামাসার আসর বসবে। স্বয়ং স্বর্গের ইন্দ্ররাজা, আসরে উপস্থিত হয়ে, নাচ গান রঙ্গ তামাসা উপভোগ করবেন। এবং ঐ বাদ্যযন্ত্রের শব্দ ফকির দারোগাবাবুকে শুনাবেন বলে সকালের মত দারোগাবাবু বিদায় হলেন।

বিকালে সন্ধ্যার পরে ফকিরের কথামত দারোগাবাবু আবার ফকিরের আস্তানায় গেলেন। সকালে দারোগাবাবু ফকিরের স্থান ত্যাগ করার সাথে সাথে তার সাঙ্গপাঙ্গদের এই বলে নির্দেশ দিলো— অন্ধকারে একটু কাছে এসে বাদ্যযন্ত্র বাজাতে হবে যেন দারোগাবাবু স্পষ্ট শুনতে পান। দারোগাবাবু ইতিমধ্যে ভণ্ডদের ধরার জন্য তার পরিকল্পনা প্রায় পাকাপোক্ত করে ফেললো। ফকিরের সাঙ্গপাঙ্গরাও তাদের পূর্বের পরিকল্পনা অনুসারে একটু কাছে এসে বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শুরু করলো। দারোগাবাবু ফকিরের কাছে উপস্থিত হতে না হতে বাদ্যযন্ত্রের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেলো। ফকির বললো — দারোগাবাবু আপনি এসেছেন? দারোগাবাবু বললেন, হ্যাঁ এসেছি। ঐ শুনুন স্বর্গে নাচ, গান রঙ্গ তামাসা শুরু হয়েছে, স্বর্গের ইন্দ্ররাজা স্বয়ং ঐ আসরে উপস্থিত হয়ে নাচ, গান, রঙ্গ তামাসা উপভোগ করতেছেন। ফকির আরও বললো যে, সে যাদের স্বর্গে পাঠিয়েছেন তারাও ঐ রঙ্গ তামাসা উপভোগ করতেছে। দারোগাবাবু বললেন হাঁ সত্যিই তো! বললেন— ফকির আমিও যাবো নাচ, গান, রঙ্গ তামাসা দেখতে। ফকির বাধা দিয়ে বললো না, আপনি সেখানে এখন যেতে পারবেন না। কারণ আপনি

এখনও স্বর্গে যাওয়ার উপযুক্ত হননি। ধর্মকর্ম করতে হবে, বিগত জীবনের ভাল কাজ, খারাপ কাজ দ্বিধাহীনভাবে আমার কাছে স্বীকার করতে হবে, তখনই স্বর্গে নেয়া যাবে কি যাবে না তা আমার বিবেচনাধীন। কিন্তু দারোগাবাবু কি আর শোনেন ফকিরের কথা! তার চারজন সিপাহী সহ রওনা হলেন পাহাড়ের দিকে বাদ্যযন্ত্র বাজনার শব্দ লক্ষ্য করে। ওদিকে ফকিরের সাঙ্গপাঙ্গরা বাদ্যযন্ত্র বাজনায় এত মশগুল ছিল যে দারোগাবাবু কখন উপস্থিত হয়েছে টেরও পেলো না। দারোগাবাবু বাদ্যবাদকদের উপর হানা দেয়। ফলে সাঙ্গপাঙ্গরা কেহ ধরাশায়ী হলো, কেউ ধরা পড়লো আর কেউবা পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো। এদিকে অবস্থা বেগতিক দেখে দারোগাবাবু স্থান ত্যাগ করার সাথে সাথে র-বান্যা ফকিরও দেয় দৌড়। আর ভক্তের দল হয়ে পড়ে সর্বস্ব হারা।

এইভাবে সমাজের এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল সহজ সরল নীরিহ ও ধর্মান্ধ লোকদের স্বর্গে নেওয়ার মতো মিথ্যা বুলি আওড়ায়ে মানুষদের ঠকিয়ে সর্বনাশ ডেকে আনে এবং জাতীয় স্বার্থের চরম হানি ঘটিয়ে থাকে। এভাবে র-বান্যা ফকিরের স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার অভিনব অবাস্তব কাণ্ডকীর্তির যবনিকা পাত হলো।

কালের প্রবাহে মানুষের মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়ে থাকে। তাই র-বান্যা ফকিরও তার সাঙ্গপাঙ্গদের ন্যায় আগের মত জনগণকে বিভ্রান্ত করতে না পারলেও অদ্যাবধি র-বান্যা ফকিরের কেরামতির শেষ নেই। যুগের তালে র-বান্যার কেরামতিও পরিবর্তিত হয়ে আসছে। তার একটা জলন্ত উদাহরণ নিয়ে এসে আলাপ করা যাক—।

আজকের দিনে ধর্মকে ব্যবহার করে র-বান্যা ফকিরের মতো তেমন কেরামতি করা না গেলেও রাজনীতির দোহাই দিয়ে তা বেশ করা যেতে পারে। বস্তুত আজকাল এই রাজনীতি নিয়েই যত কেলেঙ্কারী ও কেরামতি।

হে, পাঠক পাঠিকাগণ, আপনারা জানেন যে, আজ জুম্ম জনগণ জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে মরনপণ সংগ্রাম করে চলেছে। কিন্তু জেনে অবাক্ হবেন যে, তলে তলে নিজেদের ঘৃণিত স্বভাব চরিত্রকে লুকিয়ে রেখে দেশপ্রেমিক সেজে এই সংগ্রামের মধ্যদিয়ে ফায়দা লুঠার সংগ্রামও অনেকেই চালিয়ে আসছিল। ঘটনা প্রবাহে ওদের হীন কার্যকলাপ আজ উম্মোচিত হয়েছে। সমাজের এই স্বার্থান্বেষী মহল আজ রাজনৈতিক দালালীতে টেণ্ডার দিয়ে নিজেদের হীন স্বার্থ উদ্ধারের নেশায় র-বান্যা ফকিরের মতো অভিনব ও অবাস্তব পন্থা উদ্ভাবন করেছে আর তথাকথিত 'সুবর্ণ রাজ্য স্বর্গ'' প্রতিষ্ঠা করার নামে জুম্ম জনগণ রাতারাতি স্বাধীনতার স্বর্গ সুধা পান করানোর উদ্দেশ্যে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এতক্ষণে আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন এই স্বার্থান্বেষী মহল কারা আর কার বা কাদের কেরামতিতেই আজ জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন খুব বিপন্ন? তবুও বলছি যে প্রীতিকুমার চাকমা ওরফে প্রকাশই হচ্ছে আধুনিক কালের এ দেশের র-বান্যা ফকির। আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা গিরি-দেবেন-পলাশ-বিলাস এবং আরো কিছু সংখ্যক দেশী বিদেশী প্রকাশ ফকিরের বাদ্যবাদক দল। এদের শ্লোগান হচ্ছে র-বান্যা ফকিরের মতো তথাকথিত কল্পিত সুবর্ণ রাজ্য স্বর্গে আরোহন করানো। এই উদ্দেশ্যে দ্রুত নিস্পত্তির মত সস্তা শ্লোগান দিয়ে তথাকথিত অচেল বৈদেশিক সাহায্যের দোহাই দিয়ে এবং নানা অবাস্তব ও উদ্ভট কথার ফুলঝুরি মেরে জুম্ম জনগণ ও কর্মীবাহিনীর মধ্যে জনসংহতি সমিতির নেতা, নেতৃত্ব ও আন্দোলন সম্পর্কে বিভ্রান্তি আনার অপচেষ্টা করতে থাকে। সে পরিনতিতে কর্মীবাহিনীর মধ্যে অনেকেই বিপথগামী হলো আর সরল ও সচ্ছ জীবনের অধিকারী জুম্ম জনগণের একটা ক্ষুদ্র অংশ তথাকথিত সুবর্ণ রাজ্য স্বর্গের শ্লোগানে মুগ্ধ হয় ও বিশ্বাস করে। আর তখন যাই কোথায়? অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপর্যস্ত অনেকেই স্ব-স্ব সম্পত্তি উজার করে দিয়ে এমন কি বীজধান পর্যন্ত বিক্রি করে প্রকাশ ফকিরকে চাঁদা দিয়ে সমর্থন দিয়ে যাবে যাতে সুবর্ণ রাজ্য নামক স্বর্গ তাড়াতাড়ি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু ধীরে ধীরে র-বান্যা ভক্তদের মতো প্রকাশ ফকিরের সমর্থকদের আত্মোপলব্ধি হতে থাকে যে এসব ফাঁকা বুলি ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকাশ ফকির ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের কেরামতিতে যখন জুম্ম জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত ও জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতাকে নিহত করা হলো তখনই সুবর্ণ রাজ্য স্বর্গে আরোহনে অভিলাষী লোকেরা প্রকাশ ফকির ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের চক্রান্ত বুঝতে সক্ষম হলেন। বুঝতে পারলেন যে যুগে যুগে প্রকাশ ফকিরেরা এই ভাবে নানা বেশে নিজেদের স্বার্থে দেশ জাতিকে সর্বনাশ করতে উদ্যত হয়ে থাকে। আর জনগণের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা খেলে থাকে।

অবশেষে প্রিয় পাঠক পাঠিকাদের কাছে করজোড়ে জিজ্ঞাসা করি—আপনারাই বলুন, সুবর্ণ রাজ্য নামক স্বর্গ আরোহনের অবাস্তব ও ধ্বংসাত্মক রাজনৈতিক পালা বা পরিকল্পনা আধুনিক কালের র-বান্যার কেরামতি ও বুজরুকি নয় কি?

১০ই নভেম্বর একটি কলঙ্ক

—শ্রীসানি

আজ ১০ই নভেম্বর সম্বন্ধে কিছু লিখতে গিয়ে সত্যিই অনেক কথাই মনে পড়ছে। কোনটা রেখে কোনটা লিখবো তা নির্ধারণ করাও একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার। কারণ ১০ই নভেম্বর এর কলঙ্কিত ঘটনা গোটা জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। যা হোক আমার লিখার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের মত একটি ক্ষুদ্র অথচ নিষ্পেষিত অধিকার হারা ঘুমন্ত জাতির জাতীয় নেতার বিভেদ পন্থীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হবার পরিপ্রেক্ষিতে একজন সচেতন শীল মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবে যে প্রশ্ন জাগে তা জাতির সামনে তুলে ধরা।

১৯৮৩ সালের ১০ই নভেম্বর জুম্ম জাতির জাতীয় নেতা, ঐক্যের প্রতীক, চির সংগ্রামী মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা জুম্ম জাতির কুলাঙ্গার বিশ্বাসঘাতক গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রদ্বারা নির্মমভাবে নিহত হন। এটা জুম্ম জাতির জন্য সত্যিই লজ্জাজনক ব্যাপার। পৃথিবীর ইতিহাসে জাতিতে জাতিতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে মানুষের দ্বন্দ্ব সংঘাত এবং তা নিয়ে হানাহানি প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে চলে আসছে। আধুনিক ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজে খুন খারাপি একটা মামুলি ব্যাপার। সাধারণ ভাবে মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে যে দ্বন্দ্ব সংঘাত আছে তাতো বলা বাহুল্য।

কিন্তু লারমার হত্যা তার থেকে অনেক অনেক ভিন্ন। কেননা আমাদের মতো অনুন্নত ও পিছিয়ে পড়া জাতিতে তাঁর মতো সৃজনশীল নেতা আর জন্ম নেয়নি। সবচেয়ে বড় কথা তিনিই এদেশের ঘুমন্ত জুম্ম জনগণকে অধিকার সচেতন করে তুলেছিলেন। কিভাবে বাঁচতে হয় সেই পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মতো চিন্তাবিদ ও নেতা আমাদের মতো সমাজে আর যে কবে জন্ম নেবে অনাগত ভবিষ্যতই জানে। যিনি দক্ষ কাণ্ডারীর মতো আন্দোলনের হাল ধরে সকল প্রকারের ঝড় ঝাপটা সাহস দৃঢ়তার সহিত সংগ্রাম করে আসছিলেন আজ তার তিরোধানে সমগ্র জাতীয় জীবনে এক চরম শূন্যতা দেখা দিয়েছে। আমাদের মতো জনগোষ্ঠীর পক্ষে এহেন ঘটনা অসহনীয় ও বেমানান।

কিন্তু জুম্ম জাতির স্বাধীকার আন্দোলনে মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার ভূমিকা অনেক ভিন্নতর। আমার মতো সাধারণ কর্মী দ্বারা জুম্ম জাতির উপর লারমার ভূমিকার কথা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ লারমা ছিলেন জুম্ম জাতির সর্বপ্রথম বীর সন্তান যিনি তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার প্রভাবে সমগ্র জুম্ম জাতিকে একত্রিত করে শোষক শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। আধুনিক জুম্ম জাতীয়তাবাদের পুরোধা একমাত্র তিনিই ছিলেন। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড খরা কবলিত প্রান্তর যখন বৃষ্টির অভাবে শুকিয়ে খাঁ খাঁ করে তখন এক পশলা বৃষ্টি যেমন সমগ্র প্রান্তরে প্রাণের সঞ্চার করে সবুজের বন্যা সৃষ্টি করে সৃষ্টিকে প্রাণময় করে তোলে, ঔষধের অভাবে যখন একজন রোগী মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে তখন এক ফোটা কার্যকরী ঔষধ যেমন সেই রোগীকে আরোগ্য করে নূতন জীবন দান করে, এমনি জুম্ম জাতির সংকটকালে ঘুমন্ত জুম্ম জাতিকে প্রাণের সঞ্চার করেছিল লার্মার আবির্ভাব। অথচ সেই বিরাট ব্যক্তিত্ব, মহৎ প্রাণের অধিকারী এভাবে নিহত হবেন তা ভাবতেও পারি না। কিন্তু ইতিহাসের গতিপথ সব সময় সোজাপথে অগ্রসর হয়নি। যুগে যুগে মহাপুরুষরা বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। সত্যি কথা বলার জন্য কোপার্নিকাস-ব্রুনোকে পুড়িয়ে মরতে হয়েছিল। ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মরতে হয়েছিল যিশুকে। শয়তানরা যুগে যুগে জন্ম নিয়েছে। যুগে যুগে জন্ম নিয়েছে বিভীষণ মীরজাফর'। যারা মানুষরূপী পশু, যারা মানুষের মুক্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, মানব প্রগতিকে গলা টিপে হত্যা করতে চায়। আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামেও তার ব্যতিক্রম হলো না। ১০ই নভেম্বর জাতীয় জীবনে একটি কলঙ্কিত দিবস হিসেবে থাকবে। কিন্তু শয়তানের এ প্রচেষ্টা যুগে যুগে ব্যর্থ হয়েছে সম্মিলিত প্রচেষ্টার কাছে। তা শুধু সাময়িক কালের জন্য ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে। সত্যের বিজয় হয়েছে বার বার। তাইতো জুম্ম জাতির বিশ্বাসঘাতক, মীরজাফর বেঈমান 'গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ-চক্রও অচিরেই সমূলে উৎপাত হতে বাধ্য।

জুম্ম জাতির জনক লার্মাকে হত্যা করে তারা চেয়েছিল জুম্ম জাতির জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে চিরদিনের জন্য বানচাল করে দিতে। শুধু তাই নয় মনুষ্যরূপী এই শয়তানরা রাতারাতি জুম্ম জনগণের নেতা সেজে চেয়েছিল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে। তারা শয়তানি উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে সরলমনা জুম্ম জনগণকে ও গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। জাতীয় অগ্রদূত মানবেন্দ্র লারমার নামে উদ্দেশ্যমূলকভাবে মিথ্যা অভিযোগ তুলেছিল জন সমক্ষে। তথাকথিত স্বতন্ত্র রাজ্য এবং দ্রুত নিষ্পত্তির শ্লোগানে তারা জুম্ম জনগণকে করতে চেয়েছিল বিপথগামী। তাদের ষড়যন্ত্র বুঝতে না পেরে অনেকেই বিপথগামী হয়েছেন। এখনো তাদের সেই ভুল ভাঙেনি কিন্তু পরিশেষে ভুল ভাঙতে বাধ্য।

জাতীয় বেঈমান চার কুচক্রী আভ্যন্তরীণ দিক থেকে জাতীয়

মুক্তি সংগ্রামে সে আঘাত হেনেছে জুম্ম জনগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আজ তা প্রতিহত। জন সংহতি সমিতির ব্যাপক কর্মী বাহিনীর নিরলস কর্ম প্রচেষ্টায় গিরি প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র আজ মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। যদিও তার জন্য অনেক প্রাণ বলি দিতে হয়েছে। হারাতে হয়েছে প্রাণপ্রিয় নেতাকে। কুচক্রীরা পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে রাতারাতি জুম্ম জনগণের নেতা বনতে চেয়েছিল। তারা ভুলে গিয়েছে লার্মা জুম্ম জনগণকে যে সংগ্রামী শিক্ষা দিয়াছেন সেই শিক্ষাকে। লার্মা তাদেরকে শুধু রাজনীতি শেখাননি, শিখিয়েছেন অনেক কিছু। গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র সেই সংগ্রামী শিক্ষা গ্রহণ করেনি। তাই তারা ইতিহাসের চাকাকে পিছনে ঘুরাতে চেয়েছিল। তারা ভুলে গেছে যে সময়ে উপমহাদেশে মীরজাফরদের জন্ম হয়েছে একই সময়ে মীরকাসিমেরও জন্ম হয়েছে।

যুগে যুগে শয়তানকে ধ্বংস করার জন্য সত্যের সৈনিকের ও অভাব হয়নি যারা সত্যকে রক্ষার জন্য নিশ্চিত মৃত্যুকে ও হাসিমুখে বরণ করে। এক লার্মা মরে গেছে সত্য কিন্তু, জুম্ম জাতির হৃদয়ে হাজারো লার্মা প্রতিদিনই জন্ম নিচ্ছে, জন্ম নেবে। পৃথিবীতে যতদিন জুম্ম জাতি বেঁচে থাকবে ততদিন লার্মার আদর্শ, নীতি ও নাম চির দেদীপ্যমান হয়ে থাকবে।

বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়

—শ্রীসজীব ধামেই

দিকে দিকে জ্বলছে বিপ্লবের অগ্নিশিখা,
জ্বলছে ল্যাটিন আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা,
এশিয়ায় আর তারই এক অংশ
পার্বত্য চট্টগ্রামে;
জ্বলছে ইহা সারা পৃথিবীতে।
মোর বিপ্লবী অভিবাদন তাদেরি
যাঁরা শহীদ হয়ে গেল জুম্ম জাতির তরে,
সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রে, প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর
ক্ষেপা কুকুরের কামড়ে,
অথবা—উৎপীড়ক শত্রুর নিকটে।
ঘৃনায় ফেটে পড়ি আমি তাদেরি উপরে—
যারা সাম্রাজ্যবাদী ক্রীড়নক হয়ে,
ক্ষিপ্ত কুকুরের ন্যায় ক্ষমতার মোহে
কামড়াচ্ছে আর কামড়াচ্ছে।
এরা কুৎসিত, এরা প্রতিক্রিয়াশীল,
এরা জানে শুধু প্রতি বিপ্লবী কাজ করতে;
তাই এরা মেতেছে—
এদেশের দশ ভাষাভাষী জুম্ম জাতির
আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার বলি দিতে,
আর—
জুম্ম জাতির গণজাগরণের কণ্ঠকে চিরতরে
রুদ্ধ করে দিয়ে,
গণবিপ্লবকে পদ দলিত করতে।
এরা নির্লজ্জ, জাতির কুলাঙ্গার আর
তাই পারলো—
চোরের মতো চুপিসারে গিয়ে রাত্রি তিন ঘটিকায়,
বিপ্লবের অগ্রদূত, জাতির অতন্দ্র প্রহরী,
পার্টির প্রতিষ্ঠাতা, নিপীড়িত জাতির বিশ্বস্ত বন্ধু
মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার পবিত্র শরীর
স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের বুলেটে
ঝাঁঝরা করে দিতে।
পারলো সহযোগী—
শুভেন্দু, পরিমল, তর্পণা, অমর, মনিময়, কল্যানময়,
সৌমিত্র আর অর্জুনকে খুন করতে,
এই সকল কোনটাই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়,
সবই প্রতিক্রিয়াশীলের ষড়যন্ত্র মাত্র।

গৃহযুদ্ধ-আন্দোলন প্রতিরোধের ষড়যন্ত্র

—শ্রীঅশোক

পার্বত্য চট্টগ্রাম—সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী শাসন শোষণে অভিশপ্ত একটি আবাসভূমি। জুম্ম জাতি—পৃথিবীর বুক থেকে বিলুপ্ত প্রায় একটি জাতি। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও জুম্ম জাতির অস্তিত্ব সংরক্ষণের কঠোর বাস্তব প্রয়োজনীয়তার অপ্রতিরোধ্য প্রয়াসের ফলশ্রুতি হলো "জনসংহতি সমিতি (UNITED PEOPLE'S PARTY)" এবং তার সশস্ত্র বাহিনী "শান্তি বাহিনীর" জন্ম। ১৯৭২ সালে জন্মলগ্নের প্রতিশ্রুতি দৃঢ়তার সাথে পালন করে এসেছে জনসংহতি সমিতি। এর ফলে জুম্ম জাতির জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব রক্ষা পেয়ে এসেছে সুনিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে। এ অবস্থা জুম্ম জনগণের মনে সৃষ্টি করেছে আশার আলো, বেঁচে থাকার সংগ্রামে সঞ্চার করেছে অসীম উদ্যম, তবুও সংগ্রামের এক যুগের মাথায় আভ্যন্তরীন রাজনৈতিক মত-বিভেদ পরিণত হয়েছে গৃহযুদ্ধে। এই যুদ্ধ জুম্ম জাতিকে করেছে আতঙ্কগ্রস্ত, বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষকে করেছে হতবাক্ এবং শত্রুকে করেছে আনন্দিত। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে—কেন এই গৃহযুদ্ধ? এই গৃহযুদ্ধের পরিণতিই বা হতে পারে কি?

গৃহযুদ্ধ ছিল অনাকাঙ্খিত, ও অনভিপ্রেত; কিন্তু বাস্তবতায় তা হলো সমুপস্থিত। এই গৃহযুদ্ধ জুম্ম সমাজের একটি ঘটনা নয়,—এটা সমাজের সামগ্রিক ঘটনা প্রবাহের সার্বিক অবস্থার অনিবার্য বহিঃপ্রকাশ; পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির আদর্শ—জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও মানবতাবাদ এর সাথে উগ্র জাতীয়তা বোধ, সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা গণতন্ত্র বিরোধী ভাবমানস ও অমানবিক মূল্য বোধের সংঘাতময়তার একটি সন্ধিক্ষণ, ঐক্যের সাথে অনৈক্যের, শৃঙ্খলার সাথে বিশৃঙ্খলার, ত্যাগের সাথে স্বার্থপরতার, এবং প্রগতির সাথে প্রতিক্রিয়াশীল দ্বন্দ্বের প্রতিফলন তথা একটি ইতিহাস। সুতরাং এই গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে সঠিক অনুধাবনের জন্য জুম্ম জাতির রাজনীতির ধারা জনসংহতি সমিতির উদ্ভব ও বিকাশের ধারা ঐতিহাসিক পটভূমির আলোকে খুঁটিয়ে দেখা অপরিহার্য্য।

১৭৮৭ সাল। তদানীন্তন চাকমা রাজারবশ্যতা স্বীকারের মধ্য দিয়ে সমগ্র জুম্ম জাতি ব্রিটিশ সরকারের নিকট হলো পদানত। প্রতিবেশী রাজ্য বাংলার পতনের ঠিক ত্রিশ বছর পরই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের আগ্রাসী নীতির শিকার হলো জুম্ম জনগণ। সম্পাদিত হলো "কার্পাস চুক্তি", জুম্ম রাজ্য পরিণত হলো করদ রাজ্যে। রাজার পরে ব্রিটিশ ভারত সরকারের যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত হলো বাংলার গভর্নরের উপর। সর্বদিক থেকে উন্নত ও শক্তিশালী ব্রিটিশের শাসন শোষণ হলো শুরু। জুম্ম জাতির জীবনে এলো নতুন ধারা। পরাজয়কে মেনে নেবার আপোষ করে চলবার সুক্ষ্ম পরিবর্তনের ধারা হলো সূচিত।

ব্রিটিশ সরকার জুম্ম জাতিকে স্থায়ীভাবে পদানত রাখবার এবং শাসন শোষণ জোরদার করবার জন্য "ভাগ করা ও শাসন করা (DIVIDE AND RULE)" নীতি চালিয়ে গেলো সুকৌশলে এবং ১৮৫১ সালে সুবিধাবাদী ও চাটুকার জুম্মদেরকে বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করে স্বীয় স্বার্থে ব্যবহার করতে লাগলো। জুম্মদের অজ্ঞতা ও জুম্ম ভূ-স্বামীদের অদূরদর্শিতার কারণে কালক্রমে সমগ্র চট্টগ্রাম অঞ্চল প্রায়ই হয়ে গেলো বাঙালী মুসলমানদের করায়ত্ব। ব্রিটিশ সরকার জুম্ম রাজ্যকে করলো দুভাগে বিভক্ত। চট্টগ্রাম (Chittagong) অঞ্চলকে করলো বাংলা প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম (Hill tracts of Chittagong) অঞ্চলকে রাখা হলো "পৃথক শাসিত এলাকা (Excluded Area)" হিসাবে। ১৯৩৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োগ করলো নিজস্ব প্রতিনিধি। ১৮৭০ সালে চালু করা হলো মৌজা প্রথা। ঘোষণা দেওয়া হলো মৌজার হেডম্যান প্রজাদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেনা। রাণী কালিন্দীর আবেদনে তা রদ করা হলো ১৮৭১ সালে। ঠিক হলো হেডম্যানগণ ব্রিটিশ প্রতিনিধি ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হলো উপেক্ষিত। ১৮৮১ সালে পার্বত্য-চট্টগ্রামকে তিনটি সার্কেলে বিভক্ত করে তিনজন চীফ নিয়োগ করা হলো। ১৯০০ সালে চালু করা হলো—Chittagong Hill Tracts Regulation—1900 (I of 1900)"। ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত। একদিকে থাকলেন চীফ (রাজা), হেডম্যান ও কার্বারী, অন্যদিকে থাকলেন ডেপুটি কমিশনার, সাব-ডিভিসন্যাল অফিসার (এস ডি ও), সার্কেল অফিসার এবং পুলিশ বাহিনী Chittagong Hill Tracts Regulation—1900 (পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি—১৯০০ সাল) এর ৩৯ নম্বর বলিত হলো "The Deputy Commissioner shall Consult the Chiefs on important matters affecting the Aadministration of Chittagong Hill tracts (ডেপুটি কমিশনার চীফদের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করবেন)"। ডেপুটি কমিশনারের ক্ষমতার উৎস হলো ব্রিটিশ সরকার। স্বাভাবিকভাবে ব্রিটিশ সরকার যা বলেন তা সবই ব্রিটিশ সরকারের নিকট হলো গ্রহণযোগ্য।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শুধু প্রশাসন পরিচালনার নামে শাসক নিয়োগ করা হলো বহুগুণ। একদিকে জুম্ম নেতৃত্বের ক্ষমতা নেওয়া হলো কেড়ে; অন্যদিকে করা হলো বহুধাবিভক্ত। জুম্ম জাতির জীবনে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী নেতৃত্ব গড়ে উঠার সম্ভাবনা হলো তিরোহিত। জাতীয় নেতৃত্ব সংগ্রামের পথ পরিহার করে গ্রহণ করলো সুবিধাবাদের পথ; আপোষের পথ। নিছক ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষার তাগিদে ব্যবহার করলো আত্মীয়তা, গোষ্ঠী, আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণতাবোধকে। এই বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়লো সমাজের গভীরে সবত্র। জনগণ হয়ে পড়লেন ঐক্যহীন ও বিশৃঙ্খল। শিক্ষার অধিকার, কথা বলার অধিকার থেকে শুরু করে সর্বপ্রকার অধিকার থেকে হয়ে পড়লেন বঞ্চিত। সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী শাসন শোষনের চরমতম রূপ হলো প্রতিষ্ঠিত। জনগণের স্বাধীনভাবে চিন্তার প্রয়োজনীয়তাও গেলো যেন ফুরিয়ে। সমাজে গড়ে উঠলো চরম জাতীয় বিশ্বাসহীনতা, পরমুখাপেক্ষিতা ও পরনির্ভরশীলতা। অধিকার আদায়ের চিন্তার স্থান দখল করে নিলো পরাধীন থাকার চিন্তা। এইভাবে চলো বহুদিন। তারপর ধীরে ধীরে এই অবস্থা থেকে অব্যাহতি পাবার পথের সন্ধান হলো শুরু। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় "জন সমিতির (PEOLES PARTY") নেতৃত্ব পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারত ডোমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করতে প্রচেষ্টা চালালো কারন উগ্র ধর্মান্ধ পাকিস্তানে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্তর্ভুক্তি মানেই জুম্ম জাতির অস্তিত্ব বিলোপ নিশ্চিত হওয়া। ভারত ডোমিনিয়নের গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে গ্রহণ করতে পারলোনা সমাজে প্রতিষ্ঠিত পুরানো নেতৃত্ব। একদিকে জুম্ম জাতির জাতীয় নেতৃত্বের বিভাজন অন্যদিকে ভারতের জাতীয় নেতৃত্বের যথাযথ দৃষ্টি আকর্ষনে অক্ষতা ও ব্রিটিশ সরকারের বিমাতাসুলভ পদক্ষেপের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম অন্তর্ভুক্ত হলো পাকিস্তানে। অধিকার আদায়ের আন্দোলনের ধারা হয়ে গেলো স্তব্ধ।

পাকিস্তানের সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামকে "পৃথক শাসিত এলাকা" রাখা হলো। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ধারা লঙ্ঘিত হতে শুরু করলো। ১৯৫৩ সালে পূর্ব পাকিস্তানের আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো পার্বত্য চট্টগ্রামেও, কিন্তু দাবী দাওয়া তুলে ধরার কোন বিধি ব্যবস্থা না থাকায় জনগণের ম্যাণ্ডেট "পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্বশাসনের দাবী" তুলে ধরতেও পারলেন না, ১৯৫৮ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ শুরু হলো, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের স্বার্থকে তোয়াক্কা না করে ও জনমত যাচাই না করে প্রেসিডেন্টের জারীকৃত Chittagong Hill Tracts Regulation (Land Acquisit on) 1958 এর ৩ (১) এর উপধারায় বর্নিত When any land held on valid title which is not resumable under the Chittagong Hill Tracts Regulatio —1900, or the rules made there under, is required for any public purpose The Deputy Commissioner may acquire such land by an order in writing"— বিধি বলে দখল করে নেওয়া হলো জায়গা জমি। ১৯৬৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের পুথব শাসিত এলাকার মর্যাদা করা হলো বাতিল ঘোষণা। জুম্ম জনগণ নীরবে নিভৃতে সবকিছুই মেনে নিতে বাধ্য হলো।

তরুন ছাত্র নেতা মাবেন্দ্র নারায়ন লারমা কাপ্তাই বাঁধে ক্ষতিগ্রস্থ উদ্বাস্তুদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবী করতে উদ্যোগী হলেন। দেশদ্রোহীতার অজুহাতে হলেন বন্দী। মুক্তি পেলেন দুবছর পর। গ্রামাঞ্চলে গড়ে উঠলো অনেক হাইস্কুল। ১৯৬১ সালে গড়ে উঠলো রাঙামাটি কলেজ। ১৯৬৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে কল্যাণ পরিষদ গঠিত হলো। ১৯৬৮—৬৯ সালের পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলনের প্রভাব ছাড়িয়ে পড়লো পার্বত্য চট্টগ্রামে। রাজনীতি নিষিদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রামে মিছিল সভা হলো অনুষ্ঠিত। ১৯৬৯ ও ৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের আইন পরিষদ ও পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচন হলো। শ্রীমানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও শ্রীঅংশোয়েপ্রু চৌধুরী প্রাদেশিক পরিষদের এবং মেজর রাজা ত্রিদিব রায় জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হলেন। পরিষদের অধিবেশন বসতে পারলোনা। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম হলো শুরু।

১৯৭১ সালে এম, এন লারমার নেতৃত্বে বুদ্ধিজীবি, তরুন যুবক ও ছাত্ররা মুক্তি সংগ্রামের স্বপক্ষে যোগ দিলেন। কিন্তু উগ্র বাঙ্গালী মুসলমান জাতীয়তাবাদও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী সুকৌশলে জুম্মদেরকে এই আন্দোলন থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করে থাকে। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব জুম্ম জাতিকে আখ্যায়িত করলো "পাকিস্তান পন্থী" হিসাবে। এতদিনকার 'ভারত পন্থী' পরিচিতি গেলো মুছে। কি সুন্দর যুক্তি! জুম্মদেরকে মুক্তিযুদ্ধ থেকে দূরে সরিয়ে দিলো মুক্তি সংগ্রামের স্থানীয় বাঙ্গালী মুসলমান প্রশাসন যন্ত্র। মুক্তি যুদ্ধ যতই এগিয়ে গেলো জুম্মদের উপর একদিকে 'ভারতপন্থী' ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অজুহাতে পাক সেনাবাহিনীর; অন্যদিকে পাকিস্তান পন্থী আখ্যায় মুক্তি বাহিনীর অত্যাচার গেলো বেড়ে। পাক-বাহিনী ও মুক্তি বাহিনী জুম্মদেরকে উৎখাতের কার্যক্রম চালিয়ে গেলো এবং বাঙ্গালী মুসলমানদের জায়গা জমি দখল চললো বেপরোয়াভাবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে ভাবতে হলো নতুন করে। দেখা গেলো কোন পক্ষই জুম্মদের জাতীয় অস্তিত্ব ও মাতৃভূমির অস্তিত্ব রক্ষা করে দিতে ইচ্ছুক নয়। জুম্ম ছাত্র ও যুবকরা যারা যেদিকে সম্ভব অস্ত্র শিক্ষার সুযোগ গ্রহণের মনস্থ করলো। কেউ যোগ দিলো মুক্তি বাহিনীতে কেউ পাকিস্তানের রাজাকার, মুজাহিদ, সেন্ট্রাল আর্মড ফোর্সে। ১৬ই ডিসেম্বর (১৯৭১ সাল) পাক-বাহিনী আত্মসমর্পণ করলো। বাংলাদেশ হলো জন্ম। মুক্তি বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বাধীনতা উৎসব পালন করলো জুম্ম নারী পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে হত্যা করে, ধর্ষণ করে, গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে

দিয়ে, লুণ্ঠন করে। সর্বশক্তি দিয়ে উগ্র বাঙালী মুসলমান জাতীয়-তাবোধ ঝাঁপিয়ে পড়লো জুম্ম জনতার উপর। কেউ আশ্রয় নিলেন বনাঞ্চলে, কেউ বনাঞ্চল পেরিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে। জুম্ম জনতা বাধিত হলেন কিন্তু অবাক হলেন না।

১৯৭২ সাল। সকল জুম্ম নেতৃবৃন্দ সম্মিলিত ভাবে "পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসনের" দাবীতে ডেপুটেশন দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট। শেখ মুজিবের সরকারের নিকট তা গ্রহণযোগ্য হলোনা। প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের অনেকেই যোগ দিলেন আওয়ামী লীগে, অনেকে বাংলাদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলে। এম, এন লারমার নেতৃত্বে গঠিত হলো "পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি।" পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের একমাত্র রাজ-নৈতিক সংগঠন জনসংহতি সমিতিতে চাকমা, মারমা (মগ) ত্রিপুরা, মুরং, খ্যাং, বোম, লুসাই, পাংখো, খুমী ও চাক-এই দশ ভাষাভাষী জুম্ম জাতির সবস্তরের মানুষ যোগ দিলেন। জন সংহতি সমিতির নেতৃত্বে ছাত্র ঐক্য হলো শক্তিশালী, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন হলো। সমাজের প্রাচীন নেতৃত্বকে পরাজিত করে পার্বত্য চট্টগ্রামের দুটি আসনেই জয়ী হলেন জনসংহতি সমিতির প্রার্থী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও চাইথোয়াই রোয়াজা। বাংলাদেশ সংসদে শ্রী লারমা ও শ্রীরোয়াজা পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্ব শাসনের দাবী তুলে ধরলেন। পাহাড়ী ছাত্র সমিতি বাংলাদেশ সরকারের নিকট ডেপুটেশন দিলেন। ৯ই জুন রাঙামাটি সহ পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন যায়গায় স্বায়ত্বশাসনের দাবীতে মিছিল সভা করলেন। অধিকার দেওয়া হলোনা। বরং জুম্ম জাতির জাতীয় অস্তিত্বের স্বতন্ত্র পরিচিতির অধিকারও নেওয়া হলো কেড়ে। বাংলাদেশের সংবিধানের ৬ নম্বর অনুচ্ছেদে ধনিত হলো "বাংলাদেশের সকল নাগরিকই বাঙালী হিসেবে পরিচিত হবেন"। শ্রীলারমা করলেন এর প্রতিবাদ। তিনি সংসদের অধিবেশনে বললেন, "বাংলাদেশের কোটি কোটি জনগণের সঙ্গে আমরা জাড়ত। সব দিক দিয়েই আমরা একসঙ্গে বাস করে আসছি। কিন্তু আমি একজন চাকমা, আমার বাপ, দাদা, চৌদ্দপুরুষ কেউ বলেন নাই আমি বাঙালী..... তিনি আরো বললেন—"আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। আমরা আমাদেরকে বাংলাদেশী বলে মনে করি। কিন্তু বাঙালী বলে নয়।" প্রতিবাদে তিনি পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করেন। অসহায় জুম্ম জাতির অধিকার রক্ষার জন্যে, জুম্ম জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে বাংলাদেশের কোন রাজনৈতিক দলই এগিয়ে এলোনা। জুম্ম জাতির সমস্যাকে বাস্তব ঐতিহাসিক দৃষ্টি-কোন থেকে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণের পরিবর্তে ইসলামের চোখে বাঙালী স্বর চোখেই প্রত্যক্ষ করলো। যেই বাঙালী জাতি পাকি-স্তানের উপনিবেশিক শাসন শোষণে অতিষ্ঠ হয়ে সংগ্রাম করেছিল, সেই বাঙালী জাতি একদিকে বাঙালী মুসলমানের শাসন-শোষণ অন্যদিকে বাঙালী মুসলমানের জোর পূর্বক জায়গাজমি দখলের সম্প্রসারণের হাত থেকে জুম্ম জাতির অস্তিত্ব ও মাতৃভূমির অস্তিত্ব রক্ষার দাবীর বাস্তবতাও ন্যায্যতা খুঁজে পেলোনা। অসহায় সরল জুম্ম জাতি নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের দায়িত্ব তুলে নিলো নিজেদের হাতে; ধারণ করলো অস্ত্র। গড়ে উঠলো জন সংহতি সমিতির সশস্ত্র সংগঠন "শান্তি বাহিনী (PEACE ARMY)।"

জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনী জন্মলগ্ন থেকেই একদিকে সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধ বাদী, আপোষ পন্থীদের নিকট হতে পেলো বাঁধা, অন্যদিকে সংগঠনের ভেতরে ও কেই ধারার বহিঃপ্রকাশ এগিয়ে চললো ধারাবাহিকভাবে। ১৯৭৩ সালের প্রথমার্ধে পাহাড়ী যুব সংঘ আত্ম প্রকাশ করে। সশস্ত্র সংঘর্ষ বাঁধে শান্তিবাহিনীর সাথে। এরপর টি পি পি (ট্রাইবেল পিপলস পার্টি)র সাথে সশস্ত্র সংঘাত হলো, এর ও পরে এলো বামাঞ্জাতা গ্রুপ এবং পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির সহযোগী সংগঠন "পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম গণমুক্তি পরিষদ।' সশস্ত্র সংঘাত হলো; শেষ পর্যন্ত নিশ্চুপ হয়ে যেতে বাধ্য হলো, ১৯৭৭ সালের ৪ঠা জুলাই সরকারের পৃষ্ঠ পোষকতায় আবির্ভূত হলো ট্রাইবেল কনভেনসন। এছাড়াও সুবিধাবাদী প্রতিক্রিয়াশী সুবিধাবাদীরা কখনো বাংলাদেশ ভিত্তিক সংগঠন আওয়ামীলীগ, জাশদাল আওয়ামী পার্টি ইত্যাদি দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আন্দোলনের বিরোধীতা করে আসছে। যেইরূপে যেইভাবেই এরা আত্মপ্রকাশ করুকনা কেন ব্যাপক জুম্ম জাতির নিকট হয়েছে প্রত্যাখ্যাত। ১৯৭৩—৭৪ সালে সুবিধাবাদী দুর্নীতিবাজ ও প্রতি-ক্রিয়াশীল কিছু সংখ্যক কর্মী দলত্যাগ করলে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে দমন করা হয়। এই সময়ে সমিতির কিছু কর্মী প্রশ্ন তুললো সমিতির আন্দোলনের কর্মসূচীর বিরুদ্ধে। ১৯৭৩ সালে দাবী তুললো নিয়ম-তান্ত্রিক পথ পুরোপুরি বর্জনের জন্য এবং ১৯৭৪ সালে ওরা আবার দাবী উত্থাপন করলো আন্দোলন বিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীল, আপোষ-পন্থী সুবিধাবাদী, নেতৃস্থানীয় জুম্মদেরকে সমিতিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য। ১৯৭৪ সালে যুদ্ধের নীতি কৌশল নিয়ে দেখা দিলো মত-সংঘাত। ১৯৭৬ সালের মাঝামাঝি থেকে বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে সশস্ত্র যুদ্ধ চললো। আন্দোলন হলো জোরদার। ১৯৭৭ সালে সমিতির জাতীয় সম্মেলন হলো অনুষ্ঠিত। পরিস্থিত মূল্যায়ণে ও সাধারণ কর্মসূচী গ্রহনে ঘটলো মত-পার্থক্য। আনুষ্ঠানিক ঐক্য হলো। নেতৃত্বের কাঠামো হলো গঠিত। কাজের উদ্যোগ হলো নেওয়া। বাংলাদেশ সরকার রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা সামরিক পরিকল্পনা নিয়ে এলো এগিয়ে। হাজার হাজার সেনাবাহিনী নিয়োগ করে ক্যান্টনমেন্ট ক্যাম্প করলো স্থাপন। সামরিক অভিযান চললো সর্বত্র। অর্থ নৈতিক অবরোধের উদ্দেশ্যে গ্রামকে গ্রাম ধ্বংস করে যুক্তগ্রাম গঠন, কৃত্রিম অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি, ধন-সম্পদ লুণ্ঠন চললো ব্যাপক আকারে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ঘটলো পরিবর্তন। কর্মীদের মধ্যে রাজনৈতিক মত-বিভেদ,

পারিবারিক সমস্যা ও দীর্ঘদিন পরিশ্রম জনিত শারীরিক অসুস্থতা উদ্যম ও সক্রিয়তায় করলো বাধা সৃষ্টি। ১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে হাজার হাজার বাঙ্গালী মুসলমানের অনুপ্রবেশ হলো শুরু। আন্দোলনে ব্যর্থ করে দেবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার কুটনৈতিক কার্যক্রমের করলো সূচনা। অনুপ্রবেশকারীদের উপর হানা হলো আঘাত। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সংঘটিত হলো যুদ্ধ। ১৯৮০ সালের ২২শে জানুয়ারী শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু) বন্দী অবস্থা থেকে বিনাসর্তে মুক্তি পেলেন ও কাজে যোগ দিলেন। ১৯৮৮ সালে প্রীতিকুমার চাকমার (প্রকাশ) সুকৌশল পূর্ণ বড়যন্ত্রে গুলিবিদ্ধ ভবতোষ দেওয়ান (গিরি) সুস্থ হয়ে কাজে যোগ দেবার মতো অবস্থার হলো সৃষ্টি। শুরু হলো প্রান চাঞ্চল্য। দলে দলে বুদ্ধিজীবি, ছাত্র-যুবকরা যোগদান করলো। কাজের অগ্রগতি হলো। শৃঙ্খলা জোরদার করার প্রশ্নও দিলো দেখা। সর্বস্তরে গঠন ও পুনর্গঠন চললো এগিয়ে। বাস্তব পরিস্থিতিকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে অক্ষম এবং স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতিপরায়ণতা থেকে মুক্ত হয়ে শৃঙ্খলা সহকারে ত্যাগ, সাহস ও ধৈর্য্যের সঙ্গে কাজ করতে অসমর্থ প্রীতিকুমার চাকমা (প্রকাশ ও দেবজ্যোতি চাকমা (দেবেন) বিরোধীতা করতে থাকে। তাদের সাথে যোগ দিলো গিরি, সাগর, পলাশ, বিলাস ও অন্যান্য ক্ষমতালোভী ইচ্ছাবিলাসী ও দুর্নীতিবাজরা। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দুর্নাম রটানো ও অপবাদ দেওয়া শুরু হলো। একদিকে বক্তব্য তুললো বাংলাদেশ সরকারের শত্রুর সাথে মোকাবিলা করে আন্দোলন টিকিয়ে রাখা আর সম্ভব নয়। অন্যদিকে প্রচার করলো তাদের সব লাইন ঠিক হয়ে গেছে। যুদ্ধের দ্রুত নিষ্পত্তি তারা করতে সক্ষম; আরো বললো যুদ্ধের দ্রুত নিষ্পত্তি করবার জন্যে প্রয়োজন কেন্দ্রীয় নেতার রদবদল। অনুন্নত পশ্চাদপদ চিন্তার অধিকারী কর্মী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয় আত্মবিশ্বাসহীনতা পরনির্ভরশীলতা পরমুখাপেক্ষিতা ও সংগ্রাম বিমুখমানসিকতা উঠলো মাথা চাড়া দিয়ে। ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে উৎসাহ ভরে এগোলো গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র। জুম্ম জাতির পশ্চাদপদতা ও সংখ্যালঘুতাকে মনে রেখে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠনমূলকভাবে এগিয়ে গেলো। ১৯৮২ এর সেপ্টেম্বর অক্টোবর জাতীয় সম্মেলন বসলো। সামরিক ও রাজনৈতিক প্রস্তাব নিয়ে বিভেদপন্থী চক্র হাজির হলো। বিভেদপন্থী চক্রের বিরোধীতার রাজনৈতিক সুসংবাদ আত্মপ্রকাশ ঘটলো প্রকাশ্যে। বহুমতমূলক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখলে হলো ব্যর্থ। সামরিক শক্তি প্রয়োগে ক্ষমতা দখলের চিন্তা করেও হটে গেল পিছু, উদ্দেশ্য ক্ষমতা দখলের পাকাপোক্ত সংগঠন করবার জন্য কিছু সময় নেওয়া। সম্মেলন কক্ষ ত্যাগ করতে না করতেই ব্যাপক কর্মী ও সাধারণ মানুষের নিকট প্রচার ও সংগঠন কাজ প্রকাশ্য ও জোড়ালো ভাবে চালিয়ে গেলো। বললো—"সম্মেলনে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তারা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দখল করেছে; শ্রীমানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু) ও তাদের অনুসারীরা অপসারিত হয়েছেন। সব লাইন ঠিক হয়ে গেছে, যুদ্ধের দ্রুত নিষ্পত্তি করতে পারবে ইত্যাদি। "কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আপ্রাণ চেষ্টা চালালো শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য। বিভেদপন্থী চক্র ঘটনা প্রবাহকে এমনভাবে চালিয়ে দিলো যার পরিণতিতে ১৯৮৩ সালের ১০ই জুনের সশস্ত্র সংঘাত ঘটে যায়। রাজনৈতিক মত বিরোধ পরিণত হয়ে সামরিক সংঘাতের ঘটলো বিস্ফোরণ। গৃহযুদ্ধ হলো শুরু। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব জাতির বৃহত্তর স্বার্থে "ক্ষমা করা ও ভুলে যাওয়া নীতির" ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ চালিয়ে যাবার জন্য" আহ্বান তুলে ধরলো। বিভেদপন্থীচক্র নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য রাজনৈতিক, সামরিক অর্থ নৈতিক প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে অনাক্রমণ চুক্তি করে আলাদা আলাদাভাবে কাজ চালিয়ে যাবার পাল্টা প্রস্তাব তুললো। ঐক্যবদ্ধ হওয়া গেলনা, তবুও চেষ্টা থাকলো অব্যাহত। ১০ই আগষ্ট বিভেদপন্থী চক্র হামলা শুরু করলো। ঐক্যবদ্ধ হবার পারস্পরিক যোগাযোগ হলো বিনষ্ট। যুদ্ধ চললো পুরোদমে। বিভেদপন্থী চক্র সর্বক্ষেত্রে হয়ে পড়লো কোণঠাসা। ঘরে বাইরে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অবস্থান হলো দৃঢ়। বিভেদপন্থী চক্র বাধ্য হয়ে এগিয়ে এলো। ঐক্যবদ্ধ হবার সিদ্ধান্ত সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে হলো গৃহীত। ঐক্য-বদ্ধ হবার প্রস্তুতি কাজ এগিয়ে চললো। প্রস্তুতি মূলক বৈঠক চলাকালীন সময়ে ১০ই নভেম্বর বর্ষণ মুখর রাত্রে অতর্কিত সশস্ত্র হামলা চালালো বিভেদপন্থী চক্র। জুম্ম জাতির জাতীয় চেতনা ও জাগরণের অগ্রদূত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের শিরোমণি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পায়ে গুলিবিদ্ধ হলেন। হত্যাকারীদেরকে সামনে পেয়ে বললেন "আমাকে হত্যা করে কি জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে?' অকুতোভয় বীর নেতাকে নরপশুরা হত্যা করলে নৃশংসভাবে। তার সঙ্গে শহীদ হলেন আরও ৮ জন। চিরদিনের জন্য বিদায় নিলেন জুম্ম জাতির ঐক্যের প্রতীক প্রিয় নেতা। এই শহীদান জুম্ম জাতির মর্মমূলে হানলো চরম আঘাত; সঞ্চার করলো অকুণ্ঠ দেশ-প্রেম, সৃষ্টি করলো গভীর জাতীয়তাবোধ, জ্বালিয়ে দিলো আত্মত্যাগের অনির্বান শিখা—জীবিত নেতার চেয়ে প্রয়াত নেতা হয়ে উঠলেন বহুগুণে শক্তিমান।

গৃহযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব হলো শুরু। দুর্নীতি পরায়ণ ক্ষমতালোভী বিভীষণ-মীরজাফর চক্রের চরম বিশ্বাসঘাতকতায় অসহনীয় ও আপোষহীন হয়ে উঠলেন কর্মী বাহিনী ও জনগণ। আরো সচেতন সক্রিয় ও উদ্যোগী হয়ে জীবন-মরণ পণে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ১০ই ডিসেম্বর ৮৩ থেকে ১০ই জানুয়ারী' ৮৪ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত হলো নির্ধারক যুদ্ধ। বিভেদপন্থী চক্র হলো পরাজিত। গৃহযুদ্ধ সমাপ্ত না হলেও আন্দোলনের চরম অনিশ্চয়তার হলো অবসান। এরও পরে আঘাতের পর আঘাত পেয়ে বিভেদপন্থী চক্র

সর্বদিক দিয়ে হয়ে পড়লো পর্যুদস্ত ও কোনঠাসা। ঘরে বাইরে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অবস্থা হলো সুদৃঢ় ও সুসংহত। কর্মী বাহিনীর দেশপ্রেম জাতীয়প্রেম, জনগণের ঐক্যশক্তি হলো অগ্নিপরীক্ষায় পরীক্ষিত।

সংগ্রামের এক স্তর থেকে আরেক স্তরে অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রতিবারই এসেছে বাধা। সময় ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই বাধার আত্মপ্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন হলেও তার মূল ধারা এক ও অভিন্ন। শতাব্দীর পরাধীনতায় জুম্ম জাতি হারিয়েছে নেতৃত্ব, ঐক্য, শৃঙ্খলা, সংগ্রাম মানসিকতা—সব কিছুই। সমাজের গভীরে শিকড় গেড়েছে সংকীর্ণ এবং সাম্প্রদায়িকতাবোধ, অমানবিক মূল্যবোধ এবং গণতন্ত্র বিরোধী ভাব-মানস। জুম্ম জাতির ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয়তাবাদ সর্বস্তরের মানুষকে একই সূত্রে গ্রথিত করবার জন্য গণতন্ত্র ও মানবতাবাদের আদর্শ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে, জনসংহতি সমিতি। সমিতির আদর্শ ও কার্যক্রম যতই এগিয়ে গেলো ততই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠলো জুম্ম জাতীয়তাবোধের সাথে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাবোধ ও উগ্র জাতীয়তাবোধের, গণতন্ত্রের সাথে গণতন্ত্র বিরোধী ভাবমানসের, মানবতাবোধের সাথে অমানবিক মূল্যবোধের মধ্যকার সংঘাত। উগ্র-জাতীয়তা বোধ, সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাবোধ, অগণতান্ত্রিক চিন্তাধারা, অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গী ঐক্যের পরিপন্থী, সংগ্রাম বিমুখ ও শৃঙ্খলায় সন্ত্রস্ত। তাই এই সব পশ্চাদপদ অনুন্নত চিন্তার অধিকারী প্রতিক্রিয়াশীল সুবিধাবাদীরা আত্মপ্রকাশ করেছে ঐক্যের বিরুদ্ধে বিভেদের রূপ দিয়ে। গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অগণতন্ত্রের রূপ নিয়ে, সংগ্রামের বিরুদ্ধে আপোষের রূপ নিয়ে। সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী, আপোষপন্থীরা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেও রাজনৈতিক ডিগবাজী খেয়ে প্রতিবারই গেছে সরে। আন্দোলনের পৃষ্ঠ দেশে হেনেছে ছুরিকাঘাত। এই দুই পরস্পর বিরোধী ধারার সংঘাত জুম্ম জাতি প্রত্যক্ষ করেছে—পাক ভারত বিভক্তির সময়ে বাংলাদেশ-পাকিস্তান বিভাগের সময়ে, সমিতির জন্ম লগ্নে ও পরবর্তীকালে এইবারের গৃহযুদ্ধ ও পূর্ববর্তী স্তর থেকে পরবর্তী স্তরে উত্তরনের ক্ষেত্রে বাধার ধারাবাহিকতার একটা বিশেষরূপ মাত্র। সামরিক অভিযান, অর্থনৈতিক অবরোধ, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক কার্যক্রম বাঙালী মুসলমান অনুপ্রবেশ ও জমি বেদখল পরিকল্পনা—সব কিছুই যখন ব্যর্থ প্রায় ঠিক তখন বাংলাদেশ সরকার আভ্যন্তরীন মত বিরোধের সুযোগ গ্রহণের জন্য প্রতীক্ষায় থাকলো। ওৎ পেতে থাকলো দেশী-বিদেশী আন্তর্জাতিক গুপ্তচর ও রাজনৈতিক দালালরা। বিভেদপন্থী চক্র ক্ষমতা দখলের দিবা স্বপ্নে হয়ে গেলো বিভোর। বিভেদপন্থীদের ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র এবং আন্দোলন ব্যর্থ করে দেবার আন্তর্জাতিক চক্রান্ত হয়ে গেলো একাকার। বিস্ফোরণ ঘটলো গৃহযুদ্ধের। গৃহযুদ্ধে একদিকে সমাজের সমগ্র প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাথে অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত বাংলাদেশ সরকারের নিয়োজিত পূর্ণ শক্তির সাথে হলো মোকাবিলা। যুদ্ধের ময়দানে আমাদের সেনাবাহিনী মুখোমুখী লড়াই করলো দুই শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে। অর্জন করলো সফলতার পর সফলতা। এই অবস্থা জুম্ম জাতি ও কর্মী বাহিনীর মনে সৃষ্টি করেছে জাতীয় আত্মবিশ্বাস, পার্টির আদর্শ ও কর্মসূচীর সঠিকতার প্রতি পরম আস্থা, প্রয়াত নেতার তিনটি মহৎগুণ—ক্ষমা গুণ শিক্ষা গুণ ও পরিবর্তন গুণের প্রতি গড়ে উঠেছে বিশেষ সমাদর, জন্ম দিয়েছে পরীক্ষিত ঐক্যবদ্ধ জুম্ম জাতির নেতাও নেতৃত্বযুক্ত শক্তিশালী পার্টির এবং অজেয় একটি জাতীয় সেনাবাহিনীর।

শতাব্দীর ঘুমন্ত জুম্ম জাত এক যুগের শিক্ষায় অনেক জেগে উঠেছে। জনগণ দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে অকৃত্রিমভাবে উদ্বুদ্ধ জুম্ম জাতির আত্মত্যাগ ও সংগ্রাম মানসিকতা গভীরভাবে সম্প্রসারিত। যুদ্ধের ময়দানে, শত্রুর বন্দীশালায়, কঠোর দুঃখ কষ্ট ও নিপীড়ন নির্যাতনে জুম্ম জাতির বীরত্ব আজ পরীক্ষিত। জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আদায়ের জন্য জুম্ম জনগণ কঠোর সাধনায় আত্মনিময়। ঐক্যবদ্ধ সচেতন ও সংগ্রামী কর্মী ও জনগণ প্রমাণ করেছে পার্বত্য চট্টগ্রামের আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আদায়ের আন্দোলন তথা জুম্ম জাতির জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব বিলুপ্তির উদ্দেশ্যে সমগ্র প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির চাপিয়ে দেওয়া গৃহযুদ্ধের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম।

চেতনার মৃত্যু নেই

—শ্রীমতী দিবা

১০ই নভেম্বর ১৯৮৩ সন জুম্ম জাতির ইতিহাসে একটি মর্মান্তিক স্মৃতি বিজড়িত দিন। এইদিন পার্বত্য চট্টলার বুকে রেখে গেলো অনেক করুণ স্মৃতি। আজ মনে দোলা দিচ্ছে বার বার সেদিনের কথা। মুখে হাসি নেই, নেই মনে আনন্দ। শুধু অশ্রুসিক্ত দু'টি আঁখি ছল ছল করছে। স্তব্ধবাক, কোথায় যেন অজানা আশঙ্কায় ভরা গুড়ুম ! গুড়ুম ! স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের বজ্রগর্জন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ছে টুপ টাপ। আর বইছে ঝড়ের হিমেল হাওয়া। অদূরে অশুভ ইঙ্গিতবহ কাকের কা-কা রব। আনমনে কোলের বাচ্চাটাকে ঘুম পাড়াতে যাচ্ছিলাম। এমনি মুহূর্তে বাইরে ধাক্কা হয়ে গেলো— গিরি—প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র জুম্ম জাতির জাতীয় চেতনার অগ্রদূত শ্রদ্ধেয় এম. এন, লারমাকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করেছে— আর তার সঙ্গে ৮ (আট) জন বিশিষ্ট সহকর্মী বন্ধুকে ও। মনে হচ্ছে যেন মাতৃভূমির এক কোন শূন্য হয়ে গেছে। আর খালি হয়ে গেছে দশটি স্নেহময়ী মায়ের কোল। তাদের এই বিদায়ের দিনে হয়তো তাই প্রকৃতিও এতো শোক সন্তপ্ত রূপ ধারণ না করে থাকতে পারেনি। কেহ কোনদিন স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি যে ক্ষণ জন্মা নেতার জীবনে এমন আকস্মিক জীবন সন্ধ্যা নেমে আসবে। আর জুম্ম জাতির ভাগ্যাকাশ থেকে খসে পড়বে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র।

তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই। চিরদিনের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ পার্টি কর্মী ও শান্তি বাহিনীর বক্ষ শূন্য করে বিদায় নিয়েছেন ১০ই নভেম্বরের ঐ কালো রাতে। জন্মভূমিকে ও অধিকার হারা জুম্ম জাতিকে ভালবেসে হাসিমুখে মরণকে বরণ করে তিনি আজ চিরনিদ্রিত। তাই আজ জুম্ম জাতি মূক, অনুতপ্ত ও শোকাভিভূত হয়ে প্রয়াত নেতা ও তাঁর সঙ্গে শহীদ বন্ধুদেরকে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করছে। শ্রদ্ধেয় নেতা এম. এন, লারমা ছিলেন জাতির কর্ণধার। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে অধিকার বঞ্চিত ঘুমন্ত জুম্ম জাতি আজ জেগেছে ও তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য দুর্বার গতিতে এগিয়ে এসেছে। জাতির এই মহা লগ্নে তাঁর মতো নেতাকে পেয়ে জুম্ম জাতি আজ গৌরবান্বিত ও ধন্য। নেতা হিসেবে তিনি ছিলেন বিচক্ষন, দূরদর্শী আদর্শবান ও উদারতার উজ্জ্বল প্রতীক। তাই জাতির অন্ধকার ভাগ্যাকাশে তিনি যেন এক উজ্জ্বল ধ্রুব নক্ষত্র। কিন্তু নেতার উদার দৃষ্টিভঙ্গিকে দুর্বলতা মনে করে ক্ষমতার লোভে গিরি-প্রকাশ-দেবেন ও পলাশ চক্র তাঁকে নির্মমভাবে খুন করতে দ্বিধাবোধ করেনি। কিন্তু জুম্ম জাতির ইতিহাসে লেখা থাকবে তাঁর চির অমর, চির অম্লান কীর্তি ও স্মৃতি।

প্রয়াত নেতা কর্ম জীবনে একজন আদর্শবান ও অভিজ্ঞ শিক্ষক হিসেবে সমাজে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর শিক্ষকতা জীবনে অনেক অনাথ ও গরীব ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যাশিক্ষা লাভের অবাধ সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পেরেছিল। [এরকম ছাত্রের মধ্যে পলাশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য] শ্রদ্ধেয় এম, এন লারমা ছাত্র-ছাত্রীদিগকে আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ করতেন ও ভালবাসতেন। স্কুলের শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র ছাত্রীদেরকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করেন ও আন্দোলনের ধ্যান ধারণা দানের জন্য দৈনন্দিন জীবনের অধিক সময় ব্যয় করতেন। তাঁর গুণমুগ্ধ অনেক ছাত্র-ছাত্রী অনেক সরকারী উচ্চপদে চাকুরীরত আর পার্টিতে ও দায়িত্ব সম্পন্ন কর্মী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। সবদিক থেকে পার্টি কর্মী বাহিনীর সংখ্যাগত ও গুণগত মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে মূল্যবান অবদান দিয়ে গেছেন ইহা ও তাঁর শিক্ষক জীবনের অক্লান্ত শ্রম ও সাধনার ফসল।

তাঁর জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁর পোষাক পরিচ্ছদে তেমন কোন চাকচিক্য নেই। সেদিক থেকে তিনি ছিলেন খুবই সাদাসিদে। স্বভাবতই তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী ও মিতব্যয়ী ; কিন্তু ছাত্রদের পাঠদানের সময় তাঁর ছিল এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। পাঠদানের কায়দা কৌশল অবলম্বনের ক্ষেত্রে তিনি খুবই সুনিপুন। তাঁর পাঠদান পদ্ধতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল কিভবে প্রতিপক্ষের যুক্তিখণ্ডন করে দিয়ে তদস্থলে নিজের যুক্তি খাড়া করা যায় সে বিষয়ের উপর বিভিন্ন বক্তৃতা দান— এ সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদিগকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দান করা। এসব বিষয়ে ক্লাশ নেবার সময় তিনি যখন সাদা পেন্ট ও টিয়া রঙের শার্ট পরিহিত অবস্থায় ক্লাশে ঢুকতেন তখন তাঁকে মানাতো খুব। আর তখন তাঁর প্রতি এক অব্যক্ত শ্রদ্ধায় মনটা ভরে উঠতে। তাই শিক্ষক জীবনে অন্যান্য শিক্ষকদের মতো তিনি অতি সহজে ছাত্র ছাত্রীদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। এখানেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হয়।

প্রয়াত এম, এন. লারমা শিক্ষক, সমাজ সেবক, চিন্তাবিদ ও রাজনীতিবিদ হিসেবেই শুধু পরিচিত নন। তিনি একাধারে সাহিত্যিক ও সঙ্গীত অনুরাগী ও বটে। সঙ্গীত জগতে বাঁশী বাজানোর প্রতি তাঁর গভীর শখ ছিল। তাই দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে সা-রে-গা মা-পা-স্বরলিপি ও "ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা" — এই দেশাত্মবোধক গানের সুর তুলে বাঁশীতে সুরের শিহরণ জাগাতেন।

তাঁর অকৃত্রিম দেশাত্মবোধের যে গভীর অনুভূতি তাঁর বাজনো বাঁশীর সুর ধ্বনিতে তা আরো বেশী প্রত্যেকের হৃদয় মন জয় করতো। ১০ই নভেম্বরের কালো রাতে ঘাতকের গুলিতে বুক ঝাঝড়া হয়ে গেলে ও কিংবা তাঁর কণ্ঠরোধ হয়ে গেলেও তাঁর দেশাত্মবোধের সেই বাঁশীর সুর কোন কালে থামবেনা এবং থামাতে পারেনা কেউ। তাঁর সেই সুর অনন্তকাল ধরে আমাদের কানে বাজবে। আজকে যারা বিভেদপন্থী ও ঘাতক সেজে আন্দোলনকে বিপথে পরিচালনা করতে উদ্যত তারাও একদিন বাঁশীর সুরে দেশকে ভালবাসার শিক্ষাকে গ্রহণ করে মোহিত না হয়ে পারেনি।

রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই অনেক সহকর্মী বন্ধু তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল ও কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল। কিন্তু তবু ও হতাশ হননি কোনদিন। তাই সেদিন থেকে বলতে গেলে পোড় খাওয়া মাটিতে ভর দিয়েই তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অগ্র যাত্রা সূচিত হয়েছিল। রাজনৈতিক জীবনের গোড়া থেকেই যেমনি দুঃখ কষ্ট পেয়েছেন, পিছনে ফেলে আসা ছাত্র জীবনটাকেও প্রয়াত নেতা তেমন সুখে কাটাবার অবকাশ পাননি। বলতে গেলে ছাত্র অবস্থা থেকেই রাজনৈতিক জীবনের কালো মেঘ তাঁর মাথার উপর ঘুরপাক খেতে শুরু করেছিল। তাই স্কুল জীবন শেষে তিনি যখন কলেজ তোরণদ্বারে পা বাড়ালেন তখনই তদানীন্তন ব্যর্থ পাকিস্তান সরকারের শ্যান দৃষ্টি তাঁর উপর পড়লো। তারপর হতে শুরু হলো তাঁকে উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে রাজদ্রোহীতার বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত করার পালা। তখনকার আমলে রাজনীতির নামে "রা" শব্দ ও উল্লেখ করা দোষনীয়। অথচ সেই রকম অবস্থাতে ও জুম্ম জাতির জাগরনের অগ্রদূত হিসেবে বিভিন্ন ঝড় ঝঞ্ঝাতের মোকাবেলা করে তাঁকে এগিয়ে আসতে হয়েছিল—মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ মালা ভেদ করে এগিয়ে আসা জাহাজের মতো করে।

অতপর কলেজ জীবনে আসার পর পরই রাজনৈতিক কারণে তাঁকে উগ্র ইসলামিক ধর্মান্ধ পাকিস্তান সরকার কারাগারে নিক্ষেপ করলো। তখন তিনি বি এ ক্লাশের ছাত্র। প্রায় দুই বছর তাঁকে কারান্তরালে থাকতে হলো। কারা জীবনে-থেকেই তিনি বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে বিপুল সংখ্যক ভোটে জয়ী হন। তিনি জুম্ম জনগণের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসনের দাবী উত্থাপন করেন। কিন্তু স্বৈরাচারী পাক সরকার তা ঘৃণা ভরে উপেক্ষা করে। এরপর উগ্র-বাঙ্গালী মুসলমান জাতীয়তাবাদী বাংলাদেশ সরকার ও পাকিস্তান সরকারের-অনুরূপ পার্বত্য চট্টগ্রামের নিপীড়িত ও শোষিত জনগণের সকল দাবীই ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেছে। উপরন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের উর্বরা জমিতে বে-আইনী বাঙালী মুসলমান অনুপ্রবেশ ঘটায়ে তাদেরকে ভিটাবাড়ী হতে উচ্ছেদ করায়ে সহায় সম্বলহীন সর্বহারাতে পরিণত করতে থাকে। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যাগুরু জুম্ম জনগণ অধিকার হারা ও সংখ্যালঘু হতে থাকে। আর বে-আইনী বাঙালী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে অনেকেই আঙ্গুল ফুলে কলাগাছের মতো বিত্তশালীতে পরিণত হতে থাকে। এইখানেই জুম্ম জনগণকে উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্রের শেষ নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার নামে বে-আইনী অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষার জন্য আর পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের কঠোর হস্তে দমন ও নিপীড়ন নির্যাতনের হাতকে শক্তিশালী করার জন্য পাহাড় ঘেরা সুজলা-সুফলা পার্বত্য অঞ্চলের প্রত্যন্ত সীমা জুড়ে আর্মি ক্যাম্প, পুলিশ ক্যাম্প সহ তিনটি সেনানিবাস পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিকামী জনগণকে উপহার দেয়। অনুপ্রবেশকারী বাঙালী মুসলমানদের বস্তী পাকাপাকী হলো আর যুগান্তরের হতভাগা পার্বত্য বাসীরা দুঃখের বোঝা মাথায় করে পাহাড়ের অন্দরে কন্দরে সরে যেতে বাধ্য হতে থাকে। এ ভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ উগ্র বাঙ্গালী মুসলমান সম্প্রসারণবাদের করাল গ্রাসে পতিত হয়। এ সব করার সাথে সাথে সরকার তার প্রশাসন কাঠামোতে ও অনেক রদ-বদল করে যার ফলে অবহেলিত জুম্ম জাতি ন্যায় বিচারের স্থলে পেয়েছিল প্রহসন আর নির্যাতন। এ ভাবে নির্মম শাসন-শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে এ দেশের মানুষ তাদের মুখের ভাষা ও প্রতিবাদ করার ক্ষমতা সবত্র হারিয়ে ফেলে। যার ফলে জাতির ভাগ্য দিনের পর দিন হতাশা ও নিরাশার অতল গহ্বরে পতিত হয়।

জাতির এরূপ মুমূর্ষ অবস্থাতে এম, এন, লারমা লক্ষী ছেলেটির মতো চুপ করে বসে থাকতে পারেননি। তাই এই সব অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেন। তিনি সংসদের ভেতরে ও বাইরে জুম্ম জনগণের মৌলিক অধিকার আদায়ে সংগ্রামী মুখর হয়ে উঠেন। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার তাঁর তথা জুম্ম জনগণের সমস্ত দাবীই ঘৃণা ভরে প্রত্যাখান করে এবং বিপরীতে প্রয়াত নেতাকে বাংলাদেশে সুউচ্চ ইমারত আর মন্ত্রীত্বের প্রলোভন দেখায়ে স্বয়ং শেখ মুজিবর রহমান শ্রদ্ধেয় এম, এন লারমাকে বশীভূত করার ব্যর্থ প্রয়াস চালাতে থাকে। কিন্তু অধিকার হারা পার্বত্য বাসীদের গণ প্রতিনিধি হিসেবে তিনি জোড়ালো কণ্ঠে সরকারের সাথে একাধিকবার বাক যুদ্ধ চালিয়েছেন। অবশেষে বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূপানাঙ্গা জুম্ম জনগণের ন্যায্য দাবী সব কিছুই অস্বীকার করে সরাসরি রাজদ্রোহীতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদী নামে আখ্যায়িত করে তার সামরিক বাহিনী লেলিয়ে দেয় পার্বত্য চট্টগ্রামের নিরীহ জনসাধারনের উপর।

জাতির এই চরম দুর্দিনে তিনি বৈধ সংগ্রামের পথ পাল্টিয়ে বিকল্প উপায় উদ্ভাবনের জন্য পার্টি ও তার কর্মী বাহিনীর কাছে জোড়ালো প্রস্তাব পাড়লেন। তার প্রস্তাব পার্টি কর্মী বাহিনীতে

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক "নিয়মতান্ত্রিক পথ" পরিহার করে "সশস্ত্র সংগ্রামের পথে" অধিকার আদায়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ ও এই সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন দিয়ে সামনে এগিয়ে এসেছিল। এ ভাবে সশস্ত্র আন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টি হলে পর তিনি ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ সরকারের সংসদ ভবন ত্যাগ করে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রামের হাল নিজের হাতে তুলে নিলেন। তারপরে সশস্ত্র আন্দোলনের রূপরেখা সুনির্দিষ্ট হয়ে উঠে ও গণ আন্দোলনের জোয়ার বইতে শুরু করে।

পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তাঁর উপস্থিতির পর হতে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি যোগ্যতার সাথে জাতিকে নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন। কিন্তু জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রামের এই পর্যায়ে তাঁর অভাব তিলে তিলে অনুভূত হয়। আন্দোলন যখন অনেক দূর এগিয়ে এসেছে; ঠিক তখনই ভ্রান্ত চিন্তাধারায় পরিচালিত ক্ষমতালোভী বিভেদ-পন্থীরা নেতা ও নেতৃত্বকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখলের জন্য একটার পর-একটা ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এই উদ্দেশ্যে দ্রুত নিষ্পত্তির মতো সস্তা শ্লোগান তুলে বিভেদ-পন্থীরা সুবিধাবাদী এক শ্রেণীর কর্মীকে সংগঠিত করে ১৪ই জুন ১৯৮৩ সালে এক দুঃখ জনক আক্রমন পরিচালনা করেছিল এবং এই আক্রমন হতে জন্ম নিল নির্মম গৃহযুদ্ধ, ভয়াবহ বিভৎস ও বিভীষিকাময় হত্যার এক তাণ্ডব লীলা।

নেতা হিসেবে শ্রদ্ধেয় এম, এন, লারমার পার্টিতে উপস্থিতি সীমাহীন গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে তিনি পার্টিকে দক্ষহস্তে হাল ধরিয়ে চালিয়ে এসেছিলেন বলে গৃহযুদ্ধের বেসামাল পরিস্থিতিতে ও তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত কর্মী বাহিনী পার্টিকে দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বদ্ধপরিকর। তাই তাঁর নির্দেশের মুখাপেক্ষী না হয়ে বিভেদ পন্থীদের সাথে বুঝাপড়ায় যাবার উদ্দেশ্যে পার্টির দক্ষিণাঞ্চলের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ইউনিট সামনে এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে বিভেদ পন্থীদের সাথে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বুঝাপড়ায় যাবার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবার পর ১৪ই জুন ১৯৮৩ সালের দুঃখ জনক সংঘর্ষে ওরা তাদের বুঝাপড়ায় যাবার সদিচ্ছার অপমৃত্যু ঘটায়। এরপর পার্টি অনুগত বাহিনী ও বিভেদ পন্থীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলতে থাকে।

অন্যায়ভাবে গৃহযুদ্ধকে ওরা বেশীদিন জিইয়ে রাখতে পারবে না এবং ক্ষমতা ও দখল করতে পারবে না-এটা নিশ্চিত হলে পর বিভেদ পন্থীরা দুরভিসন্ধিমূলকভাবে ষড়যন্ত্রের বিকল্প কৌশল অবলম্বন করে এবং প্রয়াত নেতার বিঘোষিত— "ক্ষমা করা ও ভুলে যাওয়া নীতির" ভিত্তিতে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বানে সাড়া দিয়ে শান্তি চুক্তি নামাতে দস্তখত দেয়। কিন্তু চুক্তিপত্রের কালির দাগ শুকোতে না শুকোতে পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের স্থলে ১০ই নভেম্বর ঐ কালো রাতে ষড়যন্ত্রমূলক এক ঝটিকা আক্রমনে নেতাকে অপ্রত্যাশিত ও নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করার মধ্য দিয়ে জাতির ইতিহাসকে আরো কলঙ্কিত করলো এবং ঝিমিয়ে পড়া গৃহযুদ্ধের দাবানলকে আরো পুনরুজ্জীবিত করলো।

এ কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে ১০ই নভেম্বরের ঘটনার প্রেক্ষিতে ভ্রান্ত চিন্তা ধারায় চালিত ঘাতকেরা নেতাকে হত্যা করেছিল বটে; কিন্তু তাঁর নির্দেশিত কর্মের দিশা ও আদর্শকে ওরা হত্যা করতে পারেনি। সে জন্য নেতার মহাপ্রস্থানের পর ও কর্মী সাধারণ এর মন হতাশা নিরাশা নেই। চক্রান্তকারীদের দ্বারা সংঘটিত গৃহযুদ্ধে কয়েক বীর যোদ্ধাকে পার্টি হারিয়েছে, দেশমাতা-হারিয়েছে তার অনেক সুযোগ্য সন্তানকে। ১০ই নভেম্বরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যারা ইতিহাসের কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা করেছে পার্টি কুচক্রীদেরকে বার বার ক্ষমা করতে পারে কিন্তু জাতির ইতিহাস কখন ও ক্ষমা করবে না এবং করতে ও পারে না।

সত্য কোনদিন চাপা থাকে না। তাই দিন যতই গড়াচ্ছে ততই বিভেদপন্থীদের হীন মুখোশ উন্মোচন হয়ে যাচ্ছে। তাদের সমর্থনের ভিত নড়বড়ে হয়ে উঠছে আর পায়ের তলার মাটি সরে পড়ছে যেই আত্মঘাতি গৃহযুদ্ধের জন্ম তারা দিয়েছিল সেই যুদ্ধের মধ্যেই তাদের কবর রচিত হবে ইহা ধ্রুব সত্য। অন্যদিকে শান্তি ও মুক্তিকামী জুম্ম জনগণ আর বেশীদিন গৃহযুদ্ধের বারুদের গন্ধে শ্বাস নিতে চাইছে না। তারা অচিরেই আত্মঘাতি গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন চালিয়ে যেতে বদ্ধ পরিকর। তাই জুম্ম জনগণ উত্তরোত্তর পার্টির জোড়ালো সমর্থন দিয়ে সম্মুখে এগিয়ে আসছে এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

দেশে দেশে যুগে যুগে যে কোন দেশের মুক্তি সংগ্রামে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের কার্যকলাপ আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। কোন দেশ বা জাতির ইতিহাস নেই যেখানে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের অনুপস্থিত। কিন্তু সর্বত্র এটাই প্রমাণিত যে যদিও বা বিশ্বাসঘাতকরা পথে হয়ে পথ অবরোধ করে দাঁড়ায় কিন্তু তারা বার বারই উৎখাত হতে বাধ্য। তাই প্রত্যেকটি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিশ্বাসঘাতকের কবলে পড়েও তার অগ্রগতি থেমে থাকেনি। বরঞ্চ সমস্ত রকমের বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে স্বীয় অভীষ্ট লক্ষ্য সাধনে ব্রতী হয়েছেন। কাজেই পার্টি ও তার অভীষ্ট লক্ষ্য সাধনের জন্য সম্মুখ গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে এটা সুনিশ্চিত।

অন্ধকার কালো রাতের অবসান হবে। পূব দিগন্তে লাল সূর্যের উদয় হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের লাখো লাখো নরনারীর মুখে হাসি ফুটবে। দেশ সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে। নেতার নির্দেশিত পার্টি এগিয়ে যাবে। যে জাতিকে তিনি একবার জাগিয়ে গেছেন সে

(৭৮ পৃঃ দ্রঃ)

আসুন—

আমরা প্রয়াতনেতার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করি

—শ্রীনিটো

বাঃ কি চমৎকার অভিনয়। অভিনয়ের রঙ্গমঞ্চে সার্থক অভিনেতাকে ও হার মানালো। কিন্তু এই সেই যাত্রামঞ্চে অথবা রূপালী পর্দার অভিনয় নয়। এই হচ্ছে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের অভিনয়। কথায় কথায় ফুলঝুড়ি দিয়ে মিথ্যার বেচাতি করে, নিজের কর্তৃত্বকে অন্যের ঘাড়ে চেপে দিয়ে, ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়ে দলীয় কর্মীদেরকে নিজেদের সমর্থণে টেনে আনার এক সার্থক অভিনয়। এই অভিনয়ে দেখা গেল কেমন করে একজন ন্যায়বানকে সত্যপথ থেকে সরিয়ে এনে কণ্ঠকময় পথে পরিচালিত করে এবং ক্ষমতার উর্চ্চাভিলাষে কিভাবে বিশ্বাসঘাতকতার ও ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ করা যায়। এই বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রমূলক অভিনয়ই ডেকে আনলো দশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জুম্ম জাতির জীবনে কালো ছায়া। এই অভিনেতারা তাদের সেই হীন অভিনয়ে আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতির জাতীয় জীবনকে এক ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ভাইকে ভাই না ভেবে, দেশ ও জাতিকে না চিনে, মা বোনের ইজ্জত থেকে আরম্ভ করে খুন খারাপি, রাহাজানি, চুরি ডাকাতি ইত্যাদি সমাজ ও জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থী তৎপরতা একটার পর একটা চালিয়ে এই কুখ্যাত অভিনেতারা তাদের নগ্ন ও জঘন্য চেহারা দেশবাসীর নিকট উন্মোচিত করে চলেছে।

প্রশ্ন জাগে তারা কি সত্যিই দেশ ও জাতির মুক্তি চায়? তারা কি সত্যিই রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে এক একজন সার্থক অভিনেতা হয়ে নিপীড়িত ও শোষিত জুম্ম জনগণের ভাগ্য ফিরিয়ে আনতে সক্ষম? নিশ্চয়ই নয়! অথচ তারা দাবী করছে তারাই জাতীয় চেতনার অগ্রদূত। তারাই জুম্ম জাতির ধ্রুবতারা এবং একমাত্র তাদের দ্বারাই দেশ ও জাতির জীবনে সুখশান্তি আসতে পারে। এতক্ষণে হয়তো বুঝতে পারছেন আমি কাদের কথা বলতে চাচ্ছি। হ্যাঁ, আমি বিশ্বাসঘাতক বিভেদপন্থীদের কথাই বলছি।

উপদলীয় চক্রান্ত করার পর বিভেদপন্থীরা অনেক গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তারা বলেছে— তিনমাসের মধ্যে দেশ মুক্ত করবো, বৈদেশিক সাহায্যের কোন সমস্যা নেই— ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব প্রবঞ্চনা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠে। আপনারা ভেবে দেখুন, তারা কি সত্যিকারের দেশ প্রেমিক হয়ে জুম্ম জনগণের দুঃখ দুর্দশা দেখে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে? তারা কি সত্যিই গরীব জনগণের বন্ধু নাকি নিরীহ জনগণের হন্তা? পার্টি কোন দিনই গৃহযুদ্ধ কামনা করেনি। কিন্তু আজ বিভেদপন্থীদের দ্বারা সৃষ্ট গৃহ যুদ্ধের সাথে মোকাবেলা করতে হচ্ছে— দেশ ও জাতির কথা ভেবে নিরীহ জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা দেখে পার্টি গৃহযুদ্ধের আশু সমাধান কামনা করে।

এই উদ্দেশ্যে পার্টি দেশ জাতির কথা বিবেচনা করে আন্দোলন জিইয়ে রাখার তাগিদে "ক্ষমা করা ও ভুলে যাওয়া" এই নীতির উপর বিশ্বাসী হয়ে বিভেদপন্থীদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে প্রয়াসী হয়। কিন্তু চক্রান্তকারী বেইমানরা উভয়পক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্তের কোন তোয়াক্কা না করে দেশী বিদেশী গুপ্তচর ও রাজনৈতিক দালালদের পাল্লায় পড়ে তাদের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থের জন্য চরম বিশ্বাসঘাতকতা করলো। ১০ই নভেম্বর, ১৯৮৩ সাল এক ষড়যন্ত্রমূলক অতর্কিত আক্রমণ চালালো। এই বিশ্বাসঘাতকতায় হারালাম আমাদের প্রিয় নেতাকে, জুম্ম জাতি হারালো জাতীয় চেতনার অগ্রদূতকে। আর বিশ্বের মুক্তিকামী জনতা হারালো এক মহান বন্ধুকে। আমাদের প্রয়াত নেতা ছিলেন সরল, দয়ালু ও ক্ষমাশীল। দেশ জাতির কথা তথা আন্দোলনের স্বার্থে বিভেদপন্থীদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু বিভেদপন্থীরা প্রয়াত নেতার এই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গিকে দুর্বলতা মনে করে পঞ্চম বাহিনীর চরিত্র উন্মোচন করলো। আন্দোলন কখনো সামরিক উন্মাদনা হতে পারেনা। এই আন্দোলন এ শুরুই সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিহীত থাকে। এই কারণে রাজনীতিই সামরিক কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। কিন্তু বেইমান গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ-চক্র সামরিক উন্মাদনার মাধ্যমে ১৯৮২ সালের জাতীয় সম্মেলনে পার্টির সর্বময় ক্ষমতা দখলের ব্যর্থ অপচেষ্টা চালায়। পরবর্তীতে "সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরুর অধীন" এই গণতান্ত্রিক নীতিতে অবিশ্বাসী হয়ে শেষ পর্যন্ত দেশ ও জাতির চরম সর্বনাশ করলো।

আজ আমাদের আত্মোপলব্ধি ও আত্ম জিজ্ঞাসার সময়। আত্ম তথা সামগ্রিক মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণা-

ধিকার আন্দোলন জোরদার করে তুলতে হবে। সক্রিয় কার্যকলাপের মধ্যে নিহীত রয়েছে ভবিষ্যত পরিকল্পনার চাবিকাঠি। তাই আমরা কাজে যদি উদ্যোগী ও সাহসী না হই তাহলে প্রয়াত নেতার আদর্শ ও নীতিকে অশ্রদ্ধা করার মত হবে এবং জনগণকে দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবে রূপ দেয়া থেকে দুরে থাকার সামিল হবে। সুতরাং ক্রমাগত লড়াই করে যাওয়ার মানসিকতা নিয়ে আজ আমাদের আরও ঐক্যবদ্ধ ও সচেতন হতে হবে।

যিনি ঘুমন্ত জাতিকে জাগ্রত করেছেন, যিনি তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দুরদর্শিতায় জুম্ম জনগণের মুক্তির পথ দেখিয়েছেন আজ সেই মহান নেতার মৃত্যু দিবস। আজ তাঁকে ও তাঁর প্রদর্শিত ও নির্দেশিত নীতি আদর্শকে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

সংগ্রামী সাথীরা, আসুন, আমরা যারা নেতার প্রদর্শিত ও ও নির্দেশিত আদর্শ ও নীতিতে অনুপ্রাণিত ও বিশ্বাসী হয়ে অস্ত্র ধারণ করেছি, আজকের এই শোকাবহ ও মর্মান্তিক দিনে নতুন করে জাতীয় জীবনের স্বার্থে শপথ গ্রহণ করি-জাতীয় বিশ্বাসঘাতকদের সমূলে উৎপাত করে, উগ্র বাঙ্গালী মুসলমান জাতীয়তাদী ও সম্প্রসারণবাদী বাংলাদেশ সরকারের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত হয়ে জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণ করে প্রয়াত নেতার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করি।

চেতনার মৃত্যু নেই

(৪৬ পাতার পর)

জাতিকে কেহ আর কোনদিন ঘুম পাড়াতে পারবে না।

প্রয়াত লারমা প্রথমে পৃথিবীতে এসেছিলেন স্নেহময়ী মায়ের বুক জুড়ানো ছোট্ট শিশু হয়ে, আর শেষে বিদায় নিয়ে গেলেন একজন স্মরণীয় বরণীয় জাতীয় অগ্রদূত হয়ে। তার প্রথম আগমনে একটি ছোট্ট পরিবারের একদিন হাসি আর খুসীর জোয়ার বয়েছিল। কিন্তু লক্ষ লক্ষ নরনারীকে কাঁদায়ে বিদায় নিয়ে গেলেন চিরদিনের জন্য কিন্তু তাঁর অবিনশ্বর অবদান ও স্মৃতি থাকবে চিরদিন, চির অম্লান। অবনত মস্তকে তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম ও ভক্তি জানাই।

স্মৃতির পাতা থেকে

—শ্রীদেবাশীষ

মহাকালের গর্ভে আরো একটি বছর বিলীন হয়ে গেলো। ১০ই নভেম্বর—জুম্ম জাতির ইতিহাস জঘন্যতম কলংকজনক দিন। গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের এক বিশ্বাসঘাটকতামূল আক্রমনে পার্টির প্রধান, জুম্ম জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা, জন্মভূমি ও জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ আন্দোলনের পুরোধা মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা আটজন সহকর্মীসহ এই দিনটিতে শহীদ হন। এই দিনটির স্মরণে কিছু লিখতে গিয়ে কত স্মৃতি, কত কথাই মনে পড়ছে। সংগ্রামী জীবনের বারটি বছরের মধ্যে প্রায় নয়টি বছর প্রয়াত নেতার কাছে ও দূরে থেকে বিভিন্ন কর্মপরিসরে কাজ করতে হয়েছে। সুদীর্ঘ এই কর্ম জীবনে তাঁকে ঘিরে কত স্মৃতিই না বিজড়িত হয়ে রয়েছে। সেই সব স্মৃতি আজ মনের কোঠায় ভীড় করছে; তারই একটি দিনের স্মৃতি আজকে মনকে খুবই নাড়া দিচ্ছে—

আজ আর দিন তারিখ মনে পড়ছে না; সময়টা ছিলো ১৯৭৬ সনের মার্চ মাস। প্রয়াতঃ নেতার চিঠি পেয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে একাডেমী থেকে চলে আসি। তখন সশস্ত্র আন্দোলনের কাজ তোড়জোরভাবে এগিয়ে যাচ্ছিলো। এই সময়েই তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। দুপুরে তাঁর অফিসে বসে কথা হচ্ছিলো— তিনি ট্রেনিংয়ের অগ্রগতি ও আনুসঙ্গিক সমস্যাগুলির সম্বন্ধে জেনে নিলেন। সশস্ত্র আন্দোলনের গুরুত্বের উপর আরো অনেক কথা আলোচনা করলেন। আমাদের কথাবার্তার শেষ পর্যায়ে এসে তিনি বললেন, ম্যাগজিন হাউসের শত শত হাতিয়ার আর হাজার হাজার বুলট কার হাতে তুলে দেবো?" আমি তাঁর এই প্রশ্নের অর্থ বুঝে উঠতে না পেরে কিছুক্ষন থ্ হয়ে রইলাম। একেই তো তাঁর সামনে আমরা কথা বলতে জড়তাবশতঃ অস্বস্তি বোধ করতাম; তার উপর তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছেন। কি জবাব দেবো ভেবে উঠতে না পেরে আচমকা বলে ফেললাম, "কেন এতোগুলো লোককে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে, হাতিয়ার দেওয়ার জন্যই তো।" এই জবাবে তিনি একটু অপ্রতিভ হলেন, শুধরে দেওয়ার অভিব্যক্তি নিয়ে বললেন, "নানা, আমি সে অর্থে কথাটা বলছিনে; বলছিলাম ঠিক ঠিক লোকের হাতে এই হাতিয়ারগুলো তুলে না দিলে একদিন এই হাতিয়ার নিজের দিকেই ঘুরবে।" সেদিনের তাঁর এই কথাগুলির তাৎপর্য বুঝতে

চেষ্টা করছিলাম। আর আজ শুধু বার বার মনে হচ্ছে সেই বুঝার মধ্যে কতই না গভীর উপলব্ধির অভাব ছিলো। বলাবাহুল্য আজ দূরে প্রসারী দৃষ্টি সম্পন্ন কথাগুলি সে সময় গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারলে গৃহযুদ্ধের অভিশাপ আমাদের আন্দোলনের উপর বর্ষিত হতো না।

অফিসার্স ব্যারেকে ফিরে এসে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম কিছুক্ষণ আগের আলাপের কথাবার্তাগুলি নিয়ে। মনে করতে চেষ্টা করলাম মাসখানেক আগে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের সমাগত কর্মীদের উপস্থাপিত বক্তব্যগুলি। প্রতিনিধিদের কারোর বক্তব্যেই নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা বা আন্দোলনের প্রতি দ্বি-মত পোষণের মনোভাব মোটেই ফুটে উঠেনি। সম্মেলনে সশস্ত্র আন্দোলনের রূপরেখা দেওয়া হয় এবং সাংগঠনিক সেক্টর নির্ধারণ করে প্রধান পরিচালক কর্মীদের নিয়োগ করা হয়। অথচ শত শত কর্মী তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রতি পরিপূর্ণ হস্তান্তরের ব্যাপারে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেন তা আমার কাছে জিজ্ঞাসা হয়ে রইল। কিন্তু মুখোশধারী দেশপ্রেমিকদের নগ্ন ও কুৎসিৎ রূপ যখন উপদলীয় চক্রান্তে আত্ম প্রকাশ করলো, তখনই তাঁর সেই উক্তি আমার কাছে দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। উপদলীয় চক্রান্তের হোতা প্রকাশ-দেবেন-ক্ষমতার উচ্চাবিলাসী হয়ে গিরি-পলাশকে হাতে নিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলনের পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করে জাতীয় জীবনে ডেকে আনলো এক চরম নৈরাজ্য। আন্দোলনের প্রক্রিয়া থেকে সরে গিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার ও আর্থিক কেলেংকারীতে নিজেদের নিমজ্জিত করে। পলাশ স্থানীয় দালাল ও প্রতিক্রিয়াশীলদের হাত করে নিজের নিরাপত্তা (শত্রু পক্ষ থেকে) নিশ্চিত করে এবং নিজস্ব আস্তানায় সেক্টর কার্যালয় স্থানান্তরিত করে সেখানে জাঁকিয়ে বসে হুকুমদারী করতে থাকে আর ভোগ বিলাসে হাবু-ডুবু খেতে থাকে। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিম্নস্তরের কর্মীদের অসন্তোষ ঠেকানোর জন্য স্থানীয় কম্যাণ্ডার-দের অনেককেই আর্থিক সুবিধা ও প্রমোশন দিয়ে একদল 'বিশেষ সুবিধাভোগী কর্মী জন্ম দেয়। যুদ্ধের কথা বললে নানান অজুহাত দেখায়ে ও বাক চাতুর্যের দ্বারা এড়িয়ে যেতে দেবেন ও কম কিসে? সে কেন্দ্র ও ১নং সেক্টরের মধ্যে একটি অদৃশ্য দেওয়াল সৃষ্টির মাধ্যমে তার সেক্টরে একান্ত নিজস্ব ভূবন গড়ে তোলে। নিজস্ব ভূবনের সিংহাসনে জেঁকে বসে নিজের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট থাকে ১নং সেক্টরের কর্মীরা ভুলে যায় কেন্দ্রের অস্তিত্ব ও অন্যান্য সেক্টরের কথা। মহাপ্রভু ও ত্রানকর্তা দেবেনের ভক্তি কীর্ত্তন গাইতে বেহুঁস। বোধ করি, এজন্য মহাপ্রভু দেবেনের লক্ষ টাকা দুর্নীতির খবর (ভারতীয় টিবন শাড়ীর) চোরাচালানী ব্যবসায় দেড় লক্ষাধিক টাকা বিনিয়োগ সেই অদৃশ্য দেওয়াল ভেদ করে কেন্দ্রে পৌছতে পারেনি। ভক্তদলের সেদিকে খেয়াল থাকার কথা নয়, তারা মহা-প্রভুর কাছে সমর্পিত। ১৯৭৭ সনে এক দুর্ঘটনায় গিরি পঙ্গু হয় ও দীর্ঘ কয়েক বছর পর্যন্ত চিকিৎসাধীনে থাকে। এই সময়ে গিরি শহরে জীবনের আরাম আয়েশে দিন যাপন করে সংগ্রামী জীবনের সাথীদের অসীম ত্যাগ ও সুখ দুঃখের কথা ভুলে যায়। শহরে গাড়ী ঘোড়ার আওয়াজ ও জনকলরবে ক্ষুব্ধ জনগণের আকুল কান্নার করুণ সুর চাপা পড়ে তার কর্ণকুহরে পৌছতে পারে না। সুখের বৃন্দাবনে গিরি এমন কি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু সেই কৃষ্ণের যুগ তো নেয়, যে শুধু দেহ মন সপে প্রেম গাঁথা রচনা করবে। এই যুগের রাধিকার মনোরঞ্জনের জন্য চায় টাকা। তাই চিকিৎসা ও অন্যান্য অজুহাতে গিরি আর্থিক কেলেংকারীতে জড়িত হয়ে বিদেশী রাজ-নীতি দালাল ও গুপ্তচরের খপ্পরে পড়ে। আর উপদলের প্রধান নায়ক প্রকাশ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অবস্থান করে, ক্ষমতার অপব্যবহার করে ও নানা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে গোপনে গোপনে গিরি দেবেন ও পলাশের সাথে একযোগে পার্টির সর্বময় ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র চালায়ে যেতে থাকে। প্রকাশ ও গিরির মতো ক্ষমতার লোভে অন্ধ হয়ে দেশী বিদেশী রাজনৈতিক দালাল ও গুপ্তচরের ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে পড়ে।

সশস্ত্র আন্দোলনের এহেন চরম অচলাবস্থায় বাংলাদেশ সরকার একের পর একটা অপারেশন চালায়ে আন্দোলন তচ্‌নচ্‌ করে দিতে চাইলো। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারকার করে দিলো, বেপরোয়া গণহত্যা, নারী নির্যাতন, লুঠরাজ চালালো। হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে ধরে নিয়ে গিয়ে পুনর্বাসনের নামে তথাকথিত "আদর্শ গ্রামে" বন্দী করে রাখলো। সরকারের এই জ্বালাও পোড়াও নীতির শিকার সরল নিরীহ জনগনকেও আন্দোলন-কে বাঁচানোর জন্য ব্যাপক কর্মী বাহিনী সোচ্চার হয়ে উঠলো। দাবী করলো এ অচলাবস্থার দ্রুত অবসানের, গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের অন্তরাত্মা ভয়ে কেঁপে উঠলো। কিন্তু হাল ছাড়লো না, ভরাডুবি রক্ষা পেতে হবে। শুরু হলো গুপ্ত ষড়যন্ত্র—প্রকাশ্যে নেতার গুণগানে পঞ্চমুখ আড়ালে অযোগ্যতা ও বানোয়াট দুর্নীতির অভি-যোগের বিষোদগার আর উপদলীয় চক্রান্তের পায়তারা। কর্মী বাহিনীর দাবীর প্রেক্ষিতে ১৯৮০ সনের শেষ দিকে পরিচালক কর্মীদের সমন্বয়ে কেন্দ্রে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সন্তু লার্মা এই বৈঠকে যোগ দিলে সমগ্র পার্টিতে প্রাণ চাঞ্চল্য ফিরে আছে (সন্তু লার্মা প্রায় পাঁচ বছর কারাবাসের পর বিনাশর্তে ১৯৮০ সনে মুক্তি পান) বৈঠকে সর্বসম্মতি ক্রমে সন্তু লার্মাকে তাঁর পূর্বে পদে (ফিল্ড কম্যাণ্ডার) পুনরায় আসীন হবার আহ্বান জানানো হয়। তিনি এই আহ্বানে সাড়া দেন। উচ্চ পর্যায়ের এই বৈঠকে অচলাবস্থার কারণ সমূহের আলোচনা পর্যালোচনা করে পার্টি প্রশাসন মজবুত করার জন্য নূতন প্রক্রিয়া এবং সশস্ত্র আন্দোলন জোরদার করার ব্যাপক সামরিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। চার চক্র বৈঠকের এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সমূহের প্রতি সমর্থন দিলেও মনে মনে প্রমাদ

গুনতে থাকে— শেষ রক্ষা বুঝি আর হলো না।

পূর্ণ উদ্যোগ নিয়ে নূতন প্রক্রিয়া ও সামরিক কার্যক্রম ভিত্তিক কাজ আরম্ভ হলো। গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ মুখোশ ঢেকে রাখতে পারলো না—"বেঠিক লোকের" বেঠিক চেহারা ও হীন চরিত্র ফুটে উঠলো। প্রকাশ অসুস্থতার ভান করে কেন্দ্র ছেড়ে তার আস্তানায় আসে; দেবেন এস. টি একের সামরিক পরিকল্পনা জলাঞ্জলি দিয়ে গোটা বাহিনীটাকে শত্রুর মুখে ঠেলে দিয়ে শ্বশুরালয়ে আসে। পলাশ তারও আগের অফিস-কাম-আস্তানায় প্রকাশ ও দেবেনের প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে বসে ছিলো—"থাইনী মিশন" নির্লজ্জভাবে এড়িয়ে গেলো। বলাবাহুল্য তাদের তিনজনের আস্তানাগুলি কাছাকাছি ও পাশাপাশি ছিলো। তাদের এই নৈকট্য ষড়যন্ত্রের জন্য আরো সুষ্ঠু বাতাবরন সৃষ্টি করে দেয়। চলতে থাকে একের পর এক গোপন বৈঠক আর ঘন ঘন গিরির সাথে যোগাযোগ। তাদের এই হীন আত্মঘাতী ষড়যন্ত্রের চূড়ান্ত রূপের বহিঃপ্রকাশ হয় ১৯৮২ সনের জাতীয়। বন্দুকের নল তখন কেন্দ্রের দিকে নিবদ্ধ করে জাতীয় সম্মেলনে যোগ দিলো। আওয়াজ তুললো নূতন শ্লোগান দিয়ে—জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে আন্দোলন দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে বৈদেশিক সাহায্য চাই; অযোগ্য নেতৃত্ব পরিবর্তন করতে হবে—ইত্যাদি ইত্যাদি। সমাগত প্রতিনিধিদেরকে আর্থিক ও পদবীর লোভ অভ্যুত্থানের ভয় দেখালো। প্রতিনিধিরা ভুয়া শ্লোগানে বিমোহিত হলেন না; অগনতান্ত্রিক যে কোন পদ্ধতি সমর্থন দান থেকে বিরত থাকলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে কুচক্রীরা তাদের হিংস্র চেহারা লুকায়ে বিড়াল তপস্বী সেজে জাতীয় সম্মেলনের সিদ্ধান্ত সমূহ করতালি যোগে সমর্থন দান করলো —একেই বলে বিভীষণের বহুরূপ।

পরবর্তী সামগ্রিক পরিস্থিতি প্রকাশ্য দিবালোকের চেয়ে আরো বেশী পরিষ্কার। গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র আর কাজে যোগ দেয়নি। বিশেষ সেক্টরের হেফাজতে সংরক্ষিত কেন্দ্রীয় ম্যাগজিন হাউসের হাতিয়ার ও গোলাবারুদ গোপনে অন্যত্র পাচার করে অস্ত্রসজ্জা নিতে থাকে। অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ ১৪ই জুন গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। পার্টির সুসংগঠিত বাহিনীর হাতে উপর্যুপরি মার খেয়ে রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক তথা সর্বক্ষেত্রে কোনঠাসা হয়ে পড়লে চার চক্র শান্তিপূর্ণ উপায়ে সকল সমস্যার নিরসন এবং গৃহযুদ্ধ অবসান করতে সম্মত হয়। আর তা হবে—'গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে "ক্ষমা করা ও ভুলে যাওয়ার নীতির" ভিত্তিতে। বিশ্বাসঘাতক কোন দিন বিশ্বাসের মূল্য দেয় না। শান্তি চুক্তির আড়ালে ১০ই নবেম্বর ১৯৮৩ সাল এক ষড়যন্ত্র মূলক আক্রমণ পরিচালনা করে প্রিয় নেতাকে হত্যা করে চারকুচক্রী আরো একটি মীরজাফরের ইতিহাস রচনা করলো।

আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলনে মহান ত্যাগী দেশপ্রেমিকের তাজা রক্ত ঝরলো। সেই ঝরা রক্ত মন্থন করে সেই অমৃত উঠে এলো—তা ভোগ করলো শুধু গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র এবং দেশী বিদেশী গুপ্তচর, প্রতিক্রিয়াশীল ও দালালরা, মন্থনে অমৃতের পরে যেহ গরল উঠে আসলো তা পান করবে কে? জাতীয় ও আন্দোলনের স্বার্থে প্রয়াতঃ নেতাকেই এই গরল পান করতে হলো— তাঁকেই হতে হলো নীলকণ্ঠ। প্রিয় নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তিনি এখন হিংসা-নিন্দা ও সব রকমের জাগতিক স্বার্থের উর্দ্ধে, কিন্তু রেখে গেছেন আন্দোলনের জন্য অপরাজিত পথ প্রদর্শক নীতি ও আদর্শ। তিনি তাঁর জীবন বিসর্জন দিয়ে আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেলেন—প্রতিক্রিয়াশীল সুবিধাবাদীরা কখনো ক্ষমাশীল ও দেশপ্রেমিক হতে পারে না। "সঠিক লোকের হাতে হাতিয়ার তুলে দিতে না পারলে, সেই হাতিয়ার নিজের দিকেই ঘুরে"—প্রয়াতঃ নেতার সুদূর প্রসারী এই সারগর্ভ কথা শুধু আমাদের বেলায় নয়, সকল মুক্তিকামী জাতির সশস্ত্র আন্দোলনের দিশারী হয়ে থাকবে।

মার্জনা ভিক্ষা

—শ্রীসঞ্জয়

হে দিশারী—
আমাকে ক্ষমা করো তুমি, ব্যর্থ এক ঘাতক
মিছে রক্তের হোলি খেলায় মেতেছিলাম,
স্বপ্তন রাজ্য লাভের প্রত্যাশায়—
যমরাজের কপট নয়নে, গুপ্তচরের মিথ্যা আশ্বাসে
প্রলুব্ধ হয়েছিলাম আমি।
হে মহান—
ঘাতকের ছুরিকা তোমার সিংহবক্ষপটে
যে ভাবে আমূল বিদ্ধ করেছিল—সহিয়াই বেদনা দায়ক!
পাষানের বুক চিঁড়ে পৃথিবীটা কেঁদেছিল—
সে দৃশ্য মর্ত্যের লোকেরাও দেখেছিল;
অথচ সে দিন একটুও কাঁপেনি আমার হাত।
আমি নির্বোধ, আমি খুনী,
প্রতিকৃতি আমার অক্টোপাসের মতো বীভৎস।
হে মৃত্যুঞ্জয়ী—
তুমি সত্যই মৃত্যুঞ্জয়ী, দু' কোটি অশ্রু
তোমাকে বিদায় দিলো; কিন্তু
রক্তাক্ষরে তোমার নাম লিখবে
মুক্তি পাগল মানুষ।
নিপাত যাক আমার মতো চক্রান্তকারীরা,
তুমি বিজয়ী বীর
ইতিহাস তোমার কথা বলবে।

স্মৃতি তর্পন

—শ্রীবকুল

দুনিয়াতে মহত্তম যাঁরা তাঁদের হাতে থাকে পরশ পাথর, বুকে থাকে মহতি বেদনা, দৃষ্টিতে সীমাহীন নিরীক্ষন ক্ষমতা ধৈর্য্য পাহাড়ে মৌনতা, যুগ যন্ত্রনার শেষ জ্বালা নিয়ে তারা আসেন এগিয়ে কোন একটা ভার নিতে। সেই ভার হয়তো ধ্বংসের কিংবা সৃষ্টির। যুগের আচলে তাঁদের রূপ হয় ভিন্ন কিন্তু সর্বশেষ পরিচয়ে তাঁরা শুধু পুরুষ নন—মহাপুরুষ। মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ন লার্মা তেমনি একজন যুগ পথিক, আলোক দ্রষ্টা। তিনি অবহেলিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত জুম্ম জাতির শ্রেষ্ঠ গর্ব।

এই মহাপুরুষের প্রতি স্মৃতি তর্পন আমার বেলায় একটা উৎসুক্যের ব্যাপার হলেও জাতীয় নেতার সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুবই সীমিত। কিন্তু কাঁকে ঘিরে অকৃত্রিম ভক্তি বিশ্বাস থাকলেও তা কেমন করে হয়ে উঠলো তা শুধু প্রকাশ করবো, তবে এখানে বাহুল্যমাত্র নেই। বলতে গেলে স্মৃতি মন্থন শুধু। আর তাও সেই কৈশোর জীবনের কুঁড়িয়ে পাওয়া; দরিদ্র পিতা মাতার সন্তান হিসাবে সামান্য দীক্ষিত জীবন নিয়েই আমার বিদ্যাদেবীর সাধনা শুরু হয়। বিহার একটি পূন্য ক্ষেত্র-শুধু নয়-ইহ একটি মিলন ক্ষেত্রও বটে। এই মিলন ক্ষেত্র কমলছড়ি বৌদ্ধ বিহারে বসেই মহাপুরুষকে দেখার সুযোগ হয়েছে জীবনে কয়েকবার। আমার স্মৃতি তর্পনের উপজীব্য বিষয় সেই কতিপয় দেখা স্মৃতি।

দিন তারিখ মনে নেই। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার প্রথম সাধারণ নির্বাচনের খবর নিয়ে লোকেদের আলাপ চলছে। 'জন সংহতি সমিতির কর্মীরা মাঝে মাঝে এসে দেখা দিয়ে যান। চাঁদা তোলেন, রসিদ দেন, সভাসমিতি করেন। কর্মীরা শিক্ষিত, প্রায়ই যুবক, স্কুল, কলেজ ইউনিভার্সিটির ছাত্র। বিনয়ের কথাবার্তা। কত ভাল লাগে। তাদের দেওয়া কাগজ গুলেতে লেখা থাকে ঐক্য, শিক্ষা, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীকার আদায়ের সংগ্রামের কথা'।

একদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে বিহারের দেওয়ালে দেখলাম সুন্দর সুন্দর কয়েকটা পোষ্টার প্রতীক মাটির প্রদীপ। স্বতন্ত্র প্রার্থী মানবেন্দ্র নারায়ন লার্মা, বি. এ. বি. এড এল. এল বি কে ভোট দেওয়ার আবেদন। নিবেদনে জন সংহতি সমিতি। তখন থেকে ভোটের ব্যাপারে নানা গল্প, মঞ্জু-সম্ভব কথা এর আগে কতবার শুনেছি তাঁদের দু'ভায়ের নাম। কিন্তু দেখিনী দু' চোখে। ধর্মীয় পরিবেশে বিশেষ করে কমলছড়ি বিহারে তাঁদের বিদুষী ধর্ম প্রাণ জননীর সহিত কয়েকবার দেখা হয়। সেই হাসি খুশী মায়ের মুখ। লীডারের চেহারার অনেকটা মায়ের আদল। খবর এলো-লার্মা এসেছেন গ্রামে, বিহারে আসবেন। পরের দিন তিনি আসলেন। সঙ্গে আর একজন জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা। বস্তুতঃ এর আগে তাদের দেখিনী কোনদিন। মনে মনে ভাবছিলাম পোছাকে, চলনে, বলনে একজন বড় বাবু হবেন তিনি। কিন্তু প্রথম দেখাতে', বড় বাবু দেখা অভ্যস্থ চোগে ব্যতিক্রম ঠেকল। সরল, সাদাসিদে, টিলে সাদা প্যান্ট শার্ট পরিহিত একজন অতি সাধারণ মানুষ। বন্দনান্তে নির্দিষ্ট পাতা আসনে বসলেন দু'জন। কুশলাকুশল বিনিময়ের পর আলাপে ডুবে গেলেন সং গুরুদেবের সহিত। আমি তাঁদের কাছ থেকে কয়েক গজ দুরে বসে; তাদের প্রতি অভিনিষ্ট হয়ে আছি। দেখি লীডার প্রসঙ্গক্রমে হাসেন কিন্তু হঠাৎ হাসা বন্ধ করেন। হাসার মাঝে আমার প্রতি একনিষ্ঠে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষন। তখন আমি রীতিমত বিব্রত। কি দেখছেন ইনি। কথা বলতে যেয়ে আমার দিকেও গোলামেলা তাকানো, যেন আমিও একজন তাদের আলাপের সদস্য। গম্ভীর অথচ সহজ সরল আলাপের মধ্যে তাঁকে কেমন ব্যতিক্রম মানুষ হিসাবে মনে হলো—চোখের প্রচ্ছন্ন প্রখর দৃষ্টিতে একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য।

সে বারের নির্বাচনে; উল্লেখযোগ্য ভাবেই বিজয়ী হন তিনি। জুম্ম জাতির মুক্তির প্রতীক—লার্মার দিকে কেন্দ্রীভূত দৃষ্টি সকলের। উনি কি করছেন-কোথায় কি বলছেন-পার্লামেন্টে কি দাবী জানাচ্ছেন ইত্যাদি আলোচিত হত আসরে। এম. পি. হয়েই তিনি আসলেন দ্বিতীয় বারে আমাদের গ্রামে। সে বারেও দেখি সেই একই পোশাক, এলাকার মুরব্বীদের নিয়ে সাধারণ সভার আয়োজন হল। ঠিক হল লীডারকে অভিনন্দন সহকারে বরণ করে নেবার। সব ঠিক হলে শ্রীদেবরঞ্জন মাষ্টার [প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক] লীডারের সমীপে পেশ আয়োজনের কথা, লীডার সরাসরি অসম্মতি জানালেন; বললেন-'কি দরকার সে সব করার'। শ্রীদেবও সহজে ছাড়বার পাত্র নন। তার পীড়াপীড়িতে লীডার শেষে মৌন হয়ে রইলেন। আমরা বিভিন্ন ধ্বনি দিয়ে লীডারকে এবং অন্যান্য গন্যমান্যদের বরণ করে নিলাম। মিটিং-এ তাঁকে এবং অন্যান্যদের মালা দান করা হয়।

মিটিং শেষ হল। সকলে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। তিনি তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে স্কুলের বিভিন্ন দিক দেখেছেন। আমি তাঁদের কাছ থেকে কয়েক গজ দুরে রৌদ্রের পড়ন্ত আভায় এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল আমার শরীরের রঙ এবং বস্ত্রের রঙে তখন তার সঙ্গীকে পরখ করে আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন—'দেখ কি মানিয়েছে গায়ের রঙে আর কাপড়ের রঙে'। তাঁর কাছ হতে এমনি কথা শুনে আমি খুবই পলকবোধ করেছিলাম। সে বারের সভায় তিনি কি বলেছিলেন কিছুই মনে নেই। সম্ভবতঃ প্রজ্ঞা দৃষ্টিতে 'ভাঙ্গা গড়ার' আয়োজনের,

য়া—অবধারিত তা দেখিয়েছিলেন।

তার পরের দিন বিহারে গেলেন তিনি। নিজের অজান্তেই মানুষটিকে কত আপন মনে হলো। তাঁর প্রতি সংকোচের বদলে জন্মালো শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। লীগ যেন পরিচিত কত আপন জন। সেবারে সত্যি তাঁর কাছ ঘেঁষে বসার সাহস পেলাম। মূল্যহীন হলেও কিছু কিছু কথা বলার সাহস করলাম। দেশি আমার কথাতেও তাঁর মনোযোগ। একটা হত্যাকাণ্ড ঘটনা নিয়ে কথা হচ্ছিল। তিনি সে সম্পর্কে বিস্তারিত ঘটনাটা তন্ন তন্ন করে জেনে নিচ্ছিলেন। ফাঁকে আমিও সেই সম্পর্কে একটা কথা বলে ফেললাম, শুনেই তিনি সশব্দে হাসলেন। সেই হাসিটি এত প্রাণখোলা যে আমাকে অভিভূত করে। তখন কতই না তৃপ্তি আমার অন্তরে।

তারপর কথার মোড় ঘুরিয়ে তিনি প্রসঙ্গ পাল্টালেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের সহিত আলাপের এক প্রসঙ্গে গিয়ে তিনি বলে গেলেন—'যত দিন বিপ্লবের রক্ত শিরায় শিরায় রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবাহিত না হচ্ছে, ততদিন বিপ্লবের কোন স্বার্থকতা থাকবেনা—বিপ্লব কি জিনিষ বুঝা যাবে না।' একথা বলার সময় নিজের হাতের শিরা সমূহের প্রতি আঙ্গুলি চালাচ্ছিলেন। উপস্থিত সকলেই চুপ হয়ে গেলো। তারপর এক ঢোক গিলে আবার বললেন—'আমরা ছাইয়ের উপরেই নতুন কিছু গড়বো'। আমি বুঝিনি সে দিন কেন কি জন্যে এসব কথা বলে গেলেন। কিন্তু আজ তাঁর সে দিনের কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি।

আর একবার আমাদের গ্রামে আসতে হলে তাঁকে কয়েকটা গ্রাম হয়ে? তেমনি একটা গ্রাম বেতছড়ি আসার পথে তখন বোধকরি সন্ধ্যা। এক মদ্যপায়ী কি রকম বীর বাক্য তার পত্নীর উপর বর্ষণ করছিল। তার কথা বললে সকলে হাসলেন। তিনি মদ্যপায়ীর কথা হুবহু বলে গেলেন—'আমি আজ হর্তাকর্তা, বিধাতা; আমি আমার স্ত্রীকে কাটতে পারি, মারতে পারি, খুন করতে পারি, আমি এস ডি ও, ডি সি ইত্যাদি ইত্যাদি। এরপর তিনি গম্ভীর স্বরে বললেন—"নারী জাতিকে শ্রদ্ধা করার মত মানুষিকতা গড়ে তোলা প্রগতির একটা অমূল্য শর্ত"। নারী জাতির উপর যে অত্যাচার উৎপিড়ন করা হয় সে সম্পর্কে তিনি অনেক কথা বলেছেন সেদিন। নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেন। বিভিন্ন প্রয়োজনে বেশ কয়েকবার কমলছাড়তে আসেন। যতবার তিনি এসেছেন, ততবারই রেখে গিয়েছেন আদর্শ ব্যক্তিত্বের ছাপ। একবার এক গৃহস্থের নেমন্তনে গিয়ে তাঁর এক সঙ্গীকে জল ব্যবহারের সমালোচনা করলেন—'জল এত খরচ কেন, তাতো এমনিতেই আসেনি।" বেচারা লজ্জা পেলে স্বভাবতঃই। কিন্তু তাঁর মধ্যে যে গুরুত্ব ছিল তা উপলব্ধি করতে হল তাকে।

তারপর বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রবাহে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। বিভিন্ন কারণে তিনি আত্মগোপন করলেন। জন সংস্কৃতি সমিতি নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে গোপন বিপ্লবী তৎপরতায় আত্মমগ্ন হলেন তিনি। যার জন্য এতোদিন ঘুরে ঘুরে ফিরছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের পথে প্রান্তরে আর কোন দিন দেখা হবেনি লীডারের সহিত। বিপ্লবে সক্রিয় ভাবে সামিল হলাম। তাঁর প্রতি আমার শুধু দেখা করার বাসনা আশা করেছিলাম একদিন না একদিন পূরণ হবেই। স্পষ্ট অস্পষ্টের মাঝে সেই লীডারের ছবিকে আরও বাস্তব ও বাঙময় করে তুলবো। নীজের দীনত্বকে মুছে ফেলার হয়তো এক সুন্দর সুযোগ অপেক্ষা করছে। কিন্তু বেদনা বিধুর ১০ই নভেম্বর ১৯৮০ ইং সেই আশা ধূলায় আছড়ে দিল। আর কোন দিন জীবন্ত লীডারের সহিত দেখা হবে না। এই ব্যথা নিয়েই তাঁকে স্মরণ করবো - আজীবন।

যতদূর জেনেছি সহকর্মীদের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় স্নেহবাৎসল্য ভাল-মন্দের প্রতি সদা সজাগ। কিন্তু তা কখনো সংকীর্ণতায় ডুবে যায় নি। আর মিতব্যয়ের প্রতি তাঁর অসীম মনোযোগ। কঠিন ধরনের যে কোন পরিশ্রম বিপ্লবের গুরুত্ব দিয়ে দেখতেন, বলতেন। বিপ্লবের পথে অন্তরায় হতে পারে শারীরিক অসুবিধার কারণে এ রকম পরিশ্রমের প্রতি ছিলেন বিরোধী। তিনি বরাবরই দীর্ঘ সংগ্রামের স্বার্থেই শরীর ঠিক রাখার উপলব্ধি দিতেন।

তিনি ছিলেন আত্মনির্ভরশীল। কোন উদ্দেশ্যে না থাকলে সামান্য ব্যাপারটিও তিনি নিজের জন্য নিজের পরিশ্রমেই করতেন। অথচ অনেকের মধ্য থেকে যে কোন একজন তাঁর জন্য কিছু করতে অভাব ছিল না, এ ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম দিক।

এই মহামানবটিকে অকালে, অসময়ে হারাতে হল। সে কি অপূরনীয় ক্ষতি তা ভাষায় ব্যক্ত করার নয়। অস্তিত্বের প্রশ্নে হুমকি হয়ে নিশ্চিত ধ্বংসের আবর্ত থেকে জুম্ম জাতি শেষে খুঁজে পেল যে মানুষটিকে, যে ব্যক্তির মধ্যে একটি ভবিষ্যৎ জুম্ম জাতি সৃষ্টিশীল জাতির সামগ্রিক মূল্যবোধ যার মধ্যে কেন্দ্রীভূত ও গঠিত, শতাব্দি বছরের ব্যথার সর্বশেষ জ্বালাটি যার বুকে কষাঘাত করে বার বার যাঁর মাধ্যমে সমন্বয় ঘটেছে সর্বশেষ পরিশুদ্ধ ধীশক্তির সেই শ্রেষ্ঠ জুম্ম প্রতিভাকে তাঁরই বিরাট হৃদয়ের ক্ষমাশীল পরিবেশে আশ্রিত থেকে, কপটাচারে হত্যা করে বিশ্বাসঘাতক গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র জয়গান গায়। কি জঘন্য?

মহা নেতার নৃশংস দেহাবসান সকল বাস্তবতাকে আরও পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন করে তুলছে। ব্যক্তি হিসাবে তিনি ছিলেন খাঁটি ও নিরেট। জুম্ম জাতির সুপ্ত চেতনার অন্ধকারে তিনি যে মাটির দ্বীপ শিখাটি জ্বালিয়েছেন এবং তুলে ধরেছেন তা কোন দিন ম্লান হবে না।

তাঁর মৌলিকত্বকে বিশ্লেষন করা সামান্য পরিসরে বিশেষতঃ আমার বেলায় অসম্ভব। চিন্তার সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা, তাঁর নির্ভুল প্রয়োগ এবং তাঁর যুগোপযোগী চেতনা, তাঁর মৌলিকত্বের দিক এবং তাঁকে এক বিশেষত্বে উত্তীর্ণ করেছে। যেখানে সুপ্ত জুম্ম ভবিষ্যৎ তথা বিশ্বের

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা
ও
তার সমাধানের উপায়

—শ্রীরবি

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা কি? এই সমস্যা রাজনৈতিক, না অর্থনৈতিক অথবা জাতীয়, না আঞ্চলিক? জন সংহতি সমিতি কি চায়? বছরকে বছর ধরে জনসংহতি সমিতি কেন সশস্ত্র লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে? জনসংহতি সমিতি আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার বলতে কি বুঝাতে চায়? জনসংহতি সমিতি কি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে বিশ্বাসী? — ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্য্যায়ে বিভিন্ন মহলের বিভিন্ন মতামত শোনা যায়। বস্তুতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগনের সত্যিকারের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে কি সমস্যা রয়েছে সে সম্পর্কে অদ্যাবধি কোন মহল থেকেই গভীর ভাবে অনুসন্ধান ও মূল্যায়ন করা হয়নি বলেই আজ জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আদায়ের সংগ্রাম সম্পর্কে নানা কৌতুহল ও জিজ্ঞাসা। ফলে দেশের ও বিদেশের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা এবং জনসংহতি সমিতির রাজনৈতিক ও সামরিক কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নানা প্রকারের গাঁজা খুড়ি কাহিনী ও ঘটনা উদ্ভাবন করে বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে আর জুম্ম জনগণের মৌলিক সমস্যা উদঘাটিত হতে পারছেনা। সাম্প্রতিককালে বিভেদপন্থীদের দ্বারা সৃষ্ট জনসংহতি সমিতির অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে বাংলা দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় উদ্দেশ্য প্রনোদিত সংবাদ ও নিবন্ধ প্রকাশ করে প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদী গোষ্ঠীরা জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আদায়ের সংগ্রাম বানচাল করে দিতে অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। সে কারণে তথাকথিত রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও নিবন্ধ কারেরা মশা মারতে কামান দাগছেন আর সরিষার মধ্যে ভূত দেখতে পাচ্ছেন। মাঝখানে বাংলাদেশ সরকারের সাথে জুম্ম জনগণের দ্বন্দ্ব সংঘাত তীব্রতর হচ্ছে আর অপরদিকে স্বার্থান্বেষী মহলের রুটি হালুয়ার সিংহ ভাগ নিয়ে দ্বন্দ্ব ষড়যন্ত্রের প্রতিযোগিতার মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান পরিস্থিতি কেন ও কিভাবে উদ্ভব হয়েছে? এই পরিস্থিতি সৃষ্টিতে দায়ী কে বা কারা? আর এই পরিস্থিতির একটা বস্তুনিষ্ঠ রাজনৈতিক সমাধান কিভাবে দেওয়া সম্ভব পর সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা নিয়ে যে সব জিজ্ঞাসা আর ভীড় করে আছে এসবের একটা সঠিক বিশ্লেষনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের অতীত ইতিহাসের উপর একটু আলোকপাত করা অপরিহার্য্য। চাকমা মারমা (মগ), ত্রিপুরা, লুসাই, বোম, পাংখো, খ্যাং, খুমী ও চাক ছয় লক্ষাধিক দশটি ভিন্ন ভাষাভাষীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির আবাস ভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত, নিপীড়িত ও শোষিত, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের হাতে

মুক্তিকামী জনগণের অভিন্ন যোগসূত্র সমাহিত। আজকে যারা পশ্চাদপদ মূঢ়, অবহেলিত; যারা কঠোর আয়াস নিয়ে জীবন প্রবাহ চালাচ্ছেন সেই বিষন্ন অহল্যা জায়গায় তিনি প্রত্যক্ষ করছেন আগত অনাগত প্রতিভার ছড়াছড়ি যা শুধু সময়ের ব্যবধান। সেই মৃতপ্রায় জুম্ম জাতির সোনালী ভবিষ্যতের দিনগুলো তিনি দেখেছেন প্রখর টেলিস্কোপিক দৃষ্টিতে, যেখানে মানুষের উদ্দেশ্যে সম্বন্ধে নতুন করে অবহিত, নতুন মানুষ দেখা দিবে সেদিনে। কর্মব্যস্ত জুম্ম জাতি কলকারখানায়, মাঠে ঘাটে কর্মের কোলাহল। বৈচিত্রভরা এই পার্বত্য ভূমিতে জন্ম নেবে নতুন জুম্ম জাতি, নজর পড়বে সভ্য জগতের উপমা, হয়তো তার চেয়ে কিছু বেশী। সম্ভবতঃ তাই তিনি বলতেন 'অটুট মনোবল আর অসীম ধৈর্য্য ধারণ করাটি।'

ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মধ্য দিয়ে সুদক্ষ নিপুন কাণ্ডারীর মতো তিনি এতদিন নির্ভুল বিপ্লবকে এটুকু পর্যায়ে এনে দিলেন মধ্যে হয়েছেন ক্ষত বিক্ষত। জুম্ম জাতি প্রতিষ্ঠিত পথে এমনি এক মুহূর্তে তাঁর দুঃখজনক দেহাবসান হলেও তাঁর নির্দেশিত মৌলিকত্ব দিশাগুলো আমাদের পাথেয়। বাকী পথটুকু, যেটা এখনো বন্ধুর, তাকে সামনে নিয়ে এগুতে হবে। তিনি আর নেই মানুষ যেমনি আসে আর যায়-লীডারও ঠিক তাই করলেন। কিন্তু একটু অন্যভাবে গেলেন। তবুও ভরসা এতটুকু তিনি একা ছিলেন না। তিনি রেখে গেছেন যোগ্যতর উত্তরসূরীদের। তার মানসিক আর ইচ্ছাশক্তির অধিকারীরা রয়ে গেছেন। তিনি চির তরুণ, আজীবন সংগ্রামী। ভাঙ্গাগড়ার সুন্দর রূপকার। সেই হিসেবে তিনি সাফল্য সহকারে থাকবেন উত্তরসূরীদের মাঝে 'সক্রিয় ও সজীব লামা।'

পদানত হওয়ার আগে স্বাধীন রাজার শাসনামলে সামন্তবাদী শাসন ও শোষণ ছিল। রাজন্যবর্গও অভিজাত শ্রেণীই ছিল শাসক; শাসনের নামে এই শাসক গোষ্ঠী প্রজাশ্রেণীর উপর চালাতো অকথ্য নিপীড়ন, নির্যাতন ও শোষণ। প্রজাশ্রেণী উৎপাদনেই শুধু নিয়োজিত ছিল, তাদের কোন রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক অধিকার ছিলনা।

১৭৮৭ সালে স্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের শাসনাধীনে চলে যায় ও করদ রাজ্যে পরিণত হয়। এ-পর ১৮৬০ সালে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ পার্বত্য চট্টগ্রামের আভ্যন্তরীন প্রশাসন নিজের কর্তৃত্বে নিয়ে যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক শাসিত অঞ্চল হিসেবে রাখা এবং স্বীয় স্বার্থে ও শাসনের সুবিধার্থে ১৯০০ সালে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ "১৯০০ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন" জারি করে। এই শাসনবিধি স্বৈরতান্ত্রিক উপনিবেশিক ও অগনতান্ত্রিক। এই শাসনবিধিতে জুম্ম জনগনের প্রতিনিধিত্বের কোন বিধি ব্যবস্থা নেই এবং এই শাসনবিধির দ্বারা জুম্ম জনগনকে বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার স্থায়ী ব্যবস্থা করে দেয়া হয়।

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ রাজন্যবর্গ ও অভিজাত শ্রেণীর সাথে আপোষ করে জুম্ম জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সুকৌশলে হরণ করে জনগণের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দেয়। জুম্ম জনগণ একদিকে গভর্নর ও তার প্রতিনিধি ডেপুটি কমিশনার এবং অন্যদিকে রাজন্যবর্গের দয়া ও করুণার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে বসবাস করতে বাধ্য হয়। "১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন" লঙ্ঘন করে সুকৌশলে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ একদিকে প্রশাসনিক বিভাগে বহিরাগতদেরকে অধিক সংখ্যক হারে নিয়োগ করতে থাকে আর অপরদিকে ব্যবসা বানিজ্যের কেন্দ্রস্থল সমূহ বহিরাগতদের হাতে তুলে দিতে থাকে। পরিণতিতে জুম্ম জনগণ একদিকে রাজনৈতিক-ভাবে প্রশাসন থেকে বিচ্যুত হয়ে দূরে সরে থাকতে বাধ্য হয় আর অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের অর্থ নৈতিক শোষণের শিকারে পরিণত হতে থাকে।

ব্রিটিশ শাসনামলের পর পাকিস্তান শাসনামলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত এলাকার মর্যাদা প্রদান করা হয়। কিন্তু পাকিস্তান সরকার নীতিগতভাবে এই মর্যাদা প্রদান করলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক আঞ্চলিক সত্তা লুপ্ত করে দেওয়ার হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়ে, এই উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সরকার সর্ব প্রথম ১৫ ডিসেম্বর, ১৮৮১ সালে প্রবর্তিত Chittagong Hill Tracts Frontier Police Regulation ১৯৫৮ সালেই বাতিল ঘোষণা করে দেয়।

ষাট দশকের প্রারম্ভে পার্বত্য চট্টগ্রামে বুনিয়াদি গণতন্ত্র (Basic Democracy) চালু করে যদিও এই গণতন্ত্রের বিচার বিভাগ কার্যকরী হতে পারেনি। জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব লুপ্ত করে দেওয়ার ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতা হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করার নামে ১৯৬০ সালেই কর্ণফুলী হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করা হলো। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সরল ও স্বনির্ভর অর্থনীতির উপর আচমকা একটা আঘাত এসে পড়ে। ফলে প্রায় পনর হাজার পরিবার উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে, সবচেয়ে উর্বর ও উন্নত এলাকা জলমগ্ন হয়ে যায় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনীতি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। জাতীয় অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে অসমর্থ হওয়ার এবং সুষ্ঠু পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না করার ফলে বাস্তু ভিটা হারা প্রায় ষাট হাজার জুম্ম নর-নারী সামান্য আশ্রয়ের সন্ধানে ১৯৬৪ সালে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও বার্মাতে দেশান্তরী হতে বাধ্য হয়। এর পরে সবচেয়ে মারাত্মক আঘাত হলো ১৯৬৩ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসন তান্ত্রিক মর্যাদা বাতিল করে দেওয়ায় যদিও সাংবিধানিক সংশোধনী জনমতের চাপে স্বৈরাচারী ও উগ্রধর্মান্ধ পাকিস্তান সরকার কার্যকর করতে সাহস পায়নি। সর্বোপরি পাকিস্তান শাসনামলে পঞ্চাশ দশকের প্রারম্ভ থেকেই বেআইনী মুসলমান পরিবার পুনর্বাসন, বেআইনী জমি বন্দোবস্তী ও দখল, জেলা প্রশাসনে বহিরাগতদেরকে অধিকহারে নিযুক্তি, ব্যবসা বানিজ্যের কেন্দ্র সমূহ সম্পূর্ণরূপে বহিরাগতদের হাতে হস্তান্তর করণ এবং মহাজনী শোষণের উৎসাহ ও সুযোগ প্রদান অবাধে চলতে থাকে। এসবই কিন্তু ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রামের রেগুলেশন লঙ্ঘন করে পাকিস্তান সরকার কার্যকর করতে থাকে। এই ভাবে স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে রাজনৈতিক নিপীড়ন ও অর্থনৈতিক শোষণ থেকে উদ্ধার না করে বরং জুম্ম জনগনের পৃথক শাসিত অঞ্চলের সত্তাকে চিরতরে লুপ্ত করে দেওয়ার পথ প্রশস্ত করে দিতে থাকে। পাকিস্তান আমলেই ১৯৫৬ সালেই এশিয়ার সর্ব বৃহৎ কাগজের কল পার্বত্য চট্টগ্রামের চন্দ্র ঘোনা নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। জুম্ম জনগণের রক্তের বিনিময়ে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হলো। চন্দ্রঘোনা কাগজের কল থেকে কোটি কোটি টাকা আয় হতে লাগলো। আর কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ দিয়ে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান শিল্পায়িত ও আলোকিত করা হলো অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামের হতভাগ্য জুম্ম জনগণ চাকুরী ও ব্যবসা বানিজ্য থেকে বঞ্চিত হলো, পার্বত্য চট্টগ্রাম যেই তিমিরে সেই তিমিরে নিমজ্জিত থাকলো।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সৃষ্টি হলো। সাবেক পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ নামে জন্ম লাভ করলো। নূতন দেশের নূতন শাসন জারি করা হলো। কিন্তু দেখা গেল এই নূতন শাসনেও চিরবঞ্চিত ও শোষিত জুম্ম জনগনের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষনের কোন মৌলিক অধিকার বাংলা দেশের সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ ও স্বৈরাচারী উগ্র ধর্মান্ধ পাকিস্তান সরকারের ন্যায় উগ্র বাঙ্গালী মুসলমান জাতীয়তাবাদী ও সম্প্রসারণবাদের ধারক বাহক বাংলাদেশ সরকার ও জুম্ম জনগনকে রাজনৈতিক

নিপীড়ন ও অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্ত করতে এগিয়ে আসলোনা। পক্ষান্তরে চরম দমননূলক ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করে বাংলাদেশ সরকার আগেকার সরকার সমূহ চাইতে অধিকতর নিপীড়ন, নির্যাতন ও শোষণ শুরু করে দেয়। পাকিস্তান সরকার যা করতে চেয়েছিল আর যা সমাপ্ত করতে পারেনি, বাংলাদেশ সরকার তাই করতেও অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলো। সুতরাং সুপরিকল্পিতভাবে বেআইনী অনুপ্রবেশ ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে, সাথে সাথে বেআইনী জমি বন্দোবস্তী ও দখল করা অবিশ্বাস্যভাবে চলতে থাকে। প্রতিটি সরকারী ও বেসরকারী অফিস আদালতে পিওন ঝাড়ুদার থেকে শুরু করে সর্ব্ব স্তরের চাকুরীতে বহিরাগতদেরকে নিযুক্ত করা হতে থাকে। সর্বোপরি চলতে থাকে নির্বিচারে হত্যা, ধর্ষণ, মারপিঠ, ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া ও বিভিন্ন প্রকারের নির্যাতন ও নিপীড়ন। পাইকারীভাবে জুম্ম জনগণকে পাকিস্তানের দালাল হিসেবে চিহ্নিত করা হলো। বৈদেশিক আক্রমন ও দেশরক্ষার নামে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের দীঘিনালা, রুমা ও থানিকদন এ তিনটি সেনানিবাস করা হলো। রাজাকার, মুজাহিদ ও মিজো (MIZO NATIONAL FRONT) দমনের নামে চলতে থাকে নিরীহ ও নিরপরাধী জুম্ম জনগণের উপর সামরিক অপারেশন। শত শত লোকে বিরুদ্ধে হুলিয়া ও ওয়ারেন্ট জারি করা হলো। সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হতে থাকে। অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সকল প্রকারের আবেদন নিবেদন ঘুনাক্ষরে প্রত্যাখ্যান করা হতে থাকে। সর্বোপরি জুম্ম জনগণের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও দারিদ্রতার সুযোগে প্রশাসনিক আমলাদের সহযোগিতা ও ক্ষমতার অপব্যবহারে জুম্ম জনগণের সমাজ জীবনে অনুপ্রবেশ করতে থাকে নানা দুর্নীতি ও দুরাচার। ফলত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গন কলুষিত হতে থাকে। জুম্ম জনগণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর চরম আঘাত আসতে থাকে।

১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫ সালের সামরিক অভ্যুত্থান, ৭ই নভেম্বর, ১৯৭৫ সালের সিপাহী বিপ্লব ও গনজাগরণ এবং ২৭শে মার্চ্চ ১৯৮২ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন হতে পারেনি। বরঞ্চ রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রত্যেকটি উত্থান-পতনের জুম্ম জনগণের নির্যাতন নিপীড়ন ও শোষনের রূপ ও মাত্রা নানাভাবে পরিবর্তন হয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে ফলে নূতন নূতন সমস্যা সৃষ্টি হয়ে সামগ্রিক পরিস্থিতি আরো জটিলতর হতে থাকে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তার ফ্যাসিবাদী অত্যাচার উৎপীড়ন ও শোষন থেকে জুম্ম জনগণকে রেহাই দেয়নি। জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব লুপ্ত করে দেওয়ার সর্বপ্রকারের ষড়যন্ত্র চালীয়ে তার পূর্ব সূরীদের পদাঙ্ক অনুসরন করতে থাকে। হাজার হাজার সৈন্য, বিডি আর ও পুলিশ বাহিনী জুম্ম জনগণের উপর লেলিয়ে দিয়ে জার্মানীর নাৎসী বাহিনীর কুকীর্তিগুলোকেও ম্লান করে দিয়েছে। গনহত্যা, লুণ্ঠন, নারী ধর্ষন, মার পিট, নির্য্যাতনমূলক পাশবিক অত্যাচার নিত্য নৈমত্তিক হয়ে দাড়ায়। শত শত লোককে গ্রেপ্তার করে ও গ্রামের শক্ত সমর্থ নারী পুরুষকে বিভিন্ন ক্যাম্পে আটক করে বন্দী শিবিরে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়। পিতাকে কন্যার সাথে, পুত্রকে মায়ের সাথে ভাইকে বোনের সাথে অবৈধ কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য করা হয়। যুক্ত গ্রাম ও আদর্শ গ্রাম প্রতিষ্ঠার নামে জুম্ম জনগণকে কারাগারে কাল যাপনে বাধ্য করা হয়। শান্তি বাহিনী দমনের নামে যখন তখন গ্রাম ঘেরাও করে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করা হয়। শত শত লোকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানাজারী করা হয়। প্রতিক্রিয়াশীল সুবিধাবাদী, জুম্মদের দ্বারা আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আদায়ের সংগ্রাম বানচাল করে দেয়ার উদ্দেশ্যে বিভ্রান্তমূলক কার্যকলাপও চলতে থাকে। সর্বোপরি এসব নির্যাতন, নিপীড়নের পাশাপাশি সুপরিকল্পিতভাবে চলতে লাগলো বেআইনীভাবে মুসলমান পরিবার পুনর্বাসন, জমি বন্দোবস্তী ও দখলের কার্যক্রম। এই বেআইনী বাঙ্গালী মুসলমান অনুপ্রবেশের মাত্রা পূর্বেকার সব রেকর্ড ছাপিয়ে যায়। বাংলাদেশ সরকার এই ষড়যন্ত্রের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে জুম্ম জনগণকে সংখ্যালঘিষ্ঠ করে জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব বিলুপ্তির পথ ত্বরান্বিত করতে থাকে দুটো উদ্দেশ্য নিয়েই এই বেআইনী বাঙ্গালী মুসলমান পরিবারের পুনর্বাসনের কাজ সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হতে থাকে। উদ্দেশ্য দুটো হচ্ছে—

(১) পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে সংখ্যালঘিষ্ঠ করা,

(২) বে-আইনীভাবে পুনর্বাসিত বাঙ্গালী মুসলমানদেরকে জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা;

কার্যতঃ বাংলাদেশ সরকার এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে চলেছে।

বর্ত্তমান সামরিক সরকার ও (জনদল সরকার) জাতীয়তাবাদী দলের সরকারের পদাঙ্কই অনুসরণ করে চলেছে। ফ্যাসিবাদী চরিত্রের কোন পরিবর্তন হয়নি। সর্বপ্রকারের অস্ত্র ভাষা প্রয়োগ করে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে গনহত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, গ্রেপ্তার, জেল জুলুম ইত্যাদি সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে চলেছে। পাশাপাশি বেআইনী অনুপ্রবেশের কার্যকলাপ ও অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। সর্বোপরি উগ্র ধর্মান্ধ ও উগ্র বাঙ্গালী মুসলমান জাতীয়তাবাদী বর্ত্তমান সামরিক সরকার বাংলাদেশকে ইসলামী করনের দোহাই দিয়ে জুম্ম জনগণকে ও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করণ ও ইসলামী প্রভাবে প্রভাবান্বিত করার কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছে। ছলে বলে ও কৌশলে জুম্ম নারীদের বাঙ্গালী মুসলমানের সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ করার হীন অপচেষ্ট ও অব্যাহত রয়েছে। বিগত সরকারগুলোর মতো বর্ত্তমান সামরিক সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা-নিছক রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছে এবং এই সমস্যা সমাধানের নামে নিজেদের খেয়াল খুশীমতো রাজনৈতিক প্রহসন চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ জুম্ম জনগণের

আত্মনিয়ন্ত্রণাধীকার আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসাবে আখ্যায়িত করে ক্রমাগত সামরিক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

ব্রিটিশ শাসনামল, পাকিস্তান শাসনামল ও বাংলাদেশ শাসনামলের উপর আলোকপাত করে ইহা দিবালোকের মতো পরিষ্কার যে—পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান সমস্যার জন্য যুগে যুগে শাসক গোষ্ঠীরাই একমাত্র দায়ী। এই শাসক গোষ্ঠীর শাসন শোষণের দ্বারা সৃষ্ট পুঞ্জীভূত সমস্যাদিই আজ পার্বত্য চট্টগ্রামকে অশান্ত করে তুলেছে। যুগে যুগে জুম্ম জনগণের উপর যে নির্যাতন, নিপীড়ন ও শোষন চালানো হয়ে আসছে সেই নিপীড়ন ও শোষণের যেন শেষ নেই যতদিন পর্যন্ত না তাদের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব চিরতরে হারায়। এবারে ১৮৬০-১৯৮৪ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জুম্ম জনগণ কি পেয়েছে আর কি হারিয়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত খতিয়ান করা যাক—

ব্রিটিশ শাসনামল—

১) সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ "১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি" নামে একটা সামন্ততান্ত্রিক, অগণতান্ত্রিক ও উপ-নিবেশিক শাসন বিধি প্রণয়ন করে।

২) ১৯৪৭ সালের ১৭ই আগষ্ট সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ অমুসলমান অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলমান আবাসভূমি পাকিস্তানের নিকট বলি দেয়। পক্ষান্তরে বিনিময়ে পাঞ্জাবের মুসলিম অধ্যুষিত ফিরোজপুর জেলার ফিরোজপুর ও জিরা মহকুমা ভারতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পাকিস্তান শাসনামল—

১) ১৯৪৮ Chittagong Hill Tracts Frontier Police Regulation, 1981 (III of 1881) বাতিল করে দেয়া হয়।

২) পঞ্চাশ দশকের প্রারম্ভেই রাঙ্গামাটি, রামগড় ও বান্দরবন মহকুমার বে আইনী মুসলমান পরিবারের পুণর্বাসন প্রদান করে জমি বন্দোবস্তী ও দখল করা হয়।

৩) ১৯৫৬ সালেই চন্দ্রঘোনা কাগজের কল প্রতিষ্ঠা করা হলে ও জুম্ম জনগণকে চাকুরী ও ব্যবসা বাণিজ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়।

৪) ষাট দশকের প্রারম্ভেই বুনিয়াদি গণতন্ত্র Basic Democracy) প্রবর্তন করে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

৫) ১৯৬০ সালেই কর্ণফুলী নদীতে বহুমুখী কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়।

৬) ১৯৬৩ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে সংবিধান সংশোধন করে পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের সত্তা খর্ব করে দেয়া হয়।

৭) প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বহিরাগতদের অধিক সংখ্যায় নিযুক্তি এবং ব্যবসা বাণিজ্যে বহিরাগতদেরকে এক চেটিয়া সুযোগ প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ শাসনামল—

১) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ-সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের সত্তা চিরতরে লুপ্ত করে দেয়া হয়।

২) ১৯৭৩ সালেই দীঘিনালা, রুমা ও আলিকদম এই তিন থানা সেনানিবাস করা হয়।

৩) ১৯৭৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়।

৪) ১৯৭৭ সালে সমাজবিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের নিয়ে উপজাতীয় সম্মেলন (Tribal Convention) গঠন করা হয়।

৫) ১৯৭৭ সাল থেকে যুক্ত গ্রাম ও আদর্শগ্রাম গড়ে তোলে জুম্ম জনগণকে কারাগারের জীবন যাপনে বাধ্য করা হয়।

৬) সত্তর দশকের শেষার্ধে (Tribal Cultural Institute) গঠন করা হয়।

৭) রাঙ্গামাটি, রামগড় ও বান্দরবন মহকুমায় ১৯৭৯ সাল থেকে বেআইনীভাবে প্রায় তিন লক্ষ বাঙ্গালী মুসলমান পুণর্বাসিত করা হয়। সেই সাথে বে আইনী বন্দোবস্তী ও জমি দখল করা হয়।

৮) ১৯৭২ সাল থেকে গণহত্যা, ধর্ষণ, লুন্ঠন, যত্রতত্র গ্রেপ্তার, মানসিক নির্যাতন, ঘরবাড়ী জ্বালানো পোড়ানো, কৃত্রিম অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি জেল, হুলিয়া, ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করন ও বৌদ্ধমন্দির ধ্বংস করণের মাধ্যমে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়।

৯) রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ উন্নয়ন, সরকারী ভবন নির্মাণ জুম চাষীর পুণর্বাসন, রবার প্লানটেশন, বাগিচা প্রকল্প, শিক্ষা ও সাংস্কৃতি উন্নয়নের নামে বে-আইনী মুসলমান পুণর্বাসনের কাজ জোরদার করা হয়।

১০) সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা হয়; থানার সংখ্যা ও দ্বিগুণ করা হয়; ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চলে প্রতি তিন অথবা পাঁচ মাইল অন্তর প্রতিরক্ষা বাহিনীর ক্যাম্প করে শ্বেত সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটেও উপরোক্ত খতিয়ানের ভিত্তিতে জুম্ম জনগণের কি কি মৌলিক সমস্যা বিদ্যমান যদ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব আজ বিপন্ন ও বিলুপ্ত প্রায় সে সব সমস্যা এখন নিরূপন করা যাক। প্রথমতঃ উল্লেখ্য যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের অনেক সমস্যাই বিদ্যমান তন্মধ্যে নিম্নোক্ত সমস্যাদিই হচ্ছে মৌলিক সমস্যা—

১) জুম্ম জনগণের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা—

২) জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও বিকাশের সমস্যা;

৩) পার্বত্য চট্টগ্রামে বে আইনী বাঙ্গালী মুসলমান অনুপ্রবেশ ও পুণর্বাসনের সমস্যা;

৪) জুম্ম জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যা;

জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব, জন্মভূমির অস্তিত্ব ও বিকাশের উদ্দেশ্য তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাদি সমাধান কল্পে এ যাবৎ জুম্ম জনগণের পক্ষ থেকে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাক—

ক (১) ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় জুম্ম জনগণ অমুসলিম হিসাবে ভারতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য **Bengal Border Award Commission** এর নিকট দাবী উত্থাপন করে এবং এই কারণে জুম্ম জনগণ **Chittagong Hill Tracts People Association** এর নেতৃত্বে ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ সালে রাঙ্গামাটি ডেপুটি কমিশনার কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের পতাকা উত্তোলন করে থাকে এবং এই পতাকা ২০শে আগষ্ট, ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত উড্ডিন থাকে।

(২) ১৯৪৭ সালে অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতে অন্তর্ভুক্ত করানোর উদ্দেশ্যে ভারত বিভক্তির সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের পক্ষে তিন জন নেতা দিল্লী ও কলকাতায় বাউণ্ডারী এওয়ার্ড কমিশন ও ভারতীয় নেতৃবৃন্দের নিকট প্রতিনিধিত্ব করেন।

খ) পাকিস্তান শাসনামল —

১। বেআইনী বাঙ্গালী মুসলমান পুর্ণবাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়;

২। কাপ্তাই বাঁধে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গের ক্ষতিপুরণ ও সুষ্ঠু পুণর্বাসন দাবী করা হয়;

৩। ১৯৬৩ সালের পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে সংবিধান সংশোধনীর বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়;

৪। ১৯৭০ সালে নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত স্বায়ত্তশাসনের দাবী সহ কৃষি, শিক্ষা, ভাষা ও সংস্কৃতি রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ, চাকুরী ও ব্যবসা বাণিজ্যে সুযোগ সুবিধার দাবী করা হয়।

গ) বাংলাদেশ শাসনামল—

১। ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ সালে একটি গণপ্রতিনিধিদল প্রধান মন্ত্রীর নিকট একটা স্মারকলিপি প্রদান করে। স্মারক লিপিতে ৪ চারটি বিষয় উত্থাপন করা হয় যথা—

(ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্বায়ত্ত শাসিত অঞ্চল হবে এবং ইহার একটি নিজস্ব আইন পরিষদ থাকবে;

(খ) উপজাতীয় জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির অনুরূপ সংবিধি ব্যবস্থা শাসন-

(গ) উপজাতীয় রাজাদের দফতর সংরক্ষণ করা হবে;

তন্ত্রে থাকবে;

(ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় নিয়ে শাসনতান্ত্রিক কোন সংশোধন বা পরিবর্তন যেন না হয় এরূপ সংবিধি ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।

২। ২৪শে এপ্রিল, ১৯৭২ সাল পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি পক্ষ থেকে বাংলাদেশ খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির নিকট একখানা স্মারক লিপি পেশ করা হয়। এতে নিম্নোক্ত দাবী সমূহ সন্নিবেশিত হয়-

(ক) গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সহ পৃথক অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পেতে চাই;

(গ) পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার থাকবে এরকম শাসন ব্যবস্থা চাই;

(গ) জুম্ম জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষিত হবে এরকম শাসন ব্যবস্থা পেতে চাই;

(ঘ) জমি স্বত্ব সংরক্ষিত হবে এরকম শাসন ব্যবস্থা পেতে চাই;

(ঙ) বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামে যেন কেহ বসতি স্থাপন করতে না পারে তজ্জন্য শাসন তান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা প্রবর্তন চাই;

৩। ৯ই জুন, ১৯৭২ সাল পাহাড়ী ছাত্র সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনারের নিকট একখানা স্মারকলিপি প্রদান করে। স্মারক লিপিতে নিম্নোক্ত দাবী উল্লেখ করা হয়—

(ক) আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে;

(খ) বন্দীদের বিনাশর্তে মুক্তি দিতে হবে;

(গ) বেআইনী অনুপ্রবেশ বন্ধ কর;

(ঘ) পাহাড়ী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিতে হবে;

৪। ১৯৭৩ সালে জনসংহতি সমিতি দ্বিতীয়বারের মতো নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত স্বায়ত্তশাসনের দাবী উত্থাপন করে।

৫। ১৯৭৩-৭৪ সালের জাতীয় পরিষদের প্রত্যেকটি অধিবেশনে সংসদ সদস্যদ্বয় মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা ও সাইথোয়াই রোয়াজা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জন্য নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত স্বায়ত্তশাসনের দাবী জানায়। সেই সাথে বেআইনি অনুপ্রবেশরোধ করণ, সামরিক অভিযান বন্ধ করণ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান সহ জেল জুলুম অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে সুবিচারের দাবী তোলা হয়।

৬। ঢাকাতে ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭৫ সালে জুম্ম জনগণের পক্ষ থেকে ৬৭ জন নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি প্রেসিডেন্টের নিকট স্বায়ত্তশাসনের দবী সহ বন্দী মুক্তি ও অত্যাচার বন্ধ করে সুবিচারের দাবী জানান।

৭। ১৯৭৯-১৯৮৩ সাল পর্যন্ত জাতীয় পরিষদের সদস্য উপেন্দ্র লাল

চাকমা জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবী তোলেন এবং সরকারের সকল প্রকারের অন্যায়, অবিচার ও সামরিক অভিযান ও গণহত্যা বন্ধ করে সুবিচারের দাবী তোলেন। সর্বোপরি বে-আইনী বাঙ্গালী মুসলমান অনুপ্রবেশ অবিলম্বে বন্ধ করার দাবীও উত্থাপন করেন।

৮। শান্তিপূর্ণ উপায়ে ও রাজনৈতিক পদ্ধতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধান করার উদ্দেশ্যে ১৯৭৯ সাল থেকে জনসংহতি সমিতি উদ্যোগ গ্রহণ করতে থাকে।

৯। গণহত্যা লুণ্ঠন ধর্ষণ, গ্রেপ্তার, নির্যাতন সামরিক অভিযান প্রভৃতি অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে জনসংহতি সমিতি বিভিন্ন সময়ে বিবৃতি ও প্রচার পত্রের মাধ্যমে বন্ধ করার দাবীও আবেদন রাখে।

১০। ১৫ই জুন, ১৯৮০ সাল প্রেসিডেন্ট এর নিকট রাঙ্গামাটিতে স্বায়ত্বশাসনের দাবী জানাইয়ে রাজনৈতিকভাবে সমস্যা সমাধানের জন্য একখানা স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

১১। ১৯৭২ - ১৯৮৪ পর্যন্ত জুম্ম জনগণ নিজস্ব উদ্যোগে স্থানীয় সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে এবং সুবিচারের আবেদন ও নিবেদন রাখে।

১২। ১৯৮৩ সাল থেকে জনসংহতি সমিতি পুনরায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে ও রাজনৈতিক পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত রেখেছে। সর্বোপরি সকল প্রকারের অত্যাচার, উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে গণহত্যা লুণ্ঠন, গ্রেপ্তার, ধর্ষন, পাশবিক নির্যাতন ইত্যাদি বন্ধ করনের দাবী জানিয়ে আসছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধান কল্পে সরকারী তরফ থেকে অদ্যাবধি কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো এখন পর্যালোচনা করা যাক—

ক) পাকিস্থান শাসনামলে সরকার বস্তুতঃ কোন সমস্যা নিরসন না করে সমস্যাই সৃষ্টি করতে থাকে।

খ) বাংলাদেশ শাসনামল—

১। জুম্ম জনগণের শাসনতান্ত্রিক সমস্যার কোন মূল্যায়ন না করে এবং জনগণের দাবীর প্রতি কোন গুরুত্ব প্রদান না করে ১৯৭২ সালের সংবিধান রচনা করা হয়। অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মতো জুম্ম জনগণের পৃথক শাসিত অঞ্চলের দাবী অস্বীকার করে জুম্ম জনগণকে বাঙ্গালী (মুসলমান) জাতি হিসাবে সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়।

২। তথাকথিত পাকিস্তানী দালাল দমন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান পরিস্থিতি জুম্ম জনগণের স্বায়ত্বশাসনের দাবী স্তব্ধ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সাল থেকে হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, গ্রেপ্তার পাশবিক অত্যাচার, বৌদ্ধ ভিক্ষুর উপর পাশবিক অত্যাচার ও বৃদ্ধ মন্দির ধ্বংস করণ ঘরবাড়ী জ্বালানো, সামরিক অভিযান, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করণ ইত্যাদি কঠোর দমন নীতির ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

৩। বিভেদ করে শাসন করার নীতি প্রয়োগ করা হয়।

৪। সুপরিকল্পিত উপায়ে বেআইনী বাঙ্গালী মুসলমান পুনর্বাসন প্রদান এবং জমি বন্দোবস্তী ও দখল করা হয়।

৫। ১৯৭৫ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়।

৬। ৪ঠা জুলাই ১৯৭৭ সালে প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী আপোষ-পন্থী ও সমাজবিরোধীদের নিয়ে উপজাতীয় সম্মেলন (Tribal Convention) গঠন করা হয়।

৭। ১৯৭৯ সাল থেকে অদ্যাবধি কোটি কোটি টাকার অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

৮। আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলন দমন করার নামে আর্মি, পুলিশ, বি, ডি আর, আনসার বাহিনীর সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি এবং সামরিক তৎপরতা ও অভিযান বাস্তবায়ন করণ।

৯। সিভিল প্রশাসনের নামে ১৯৭৯ সাল থেকে সামরিক শাসন প্রবর্তন।

১০। ১৯৭৮-১৯৮০ সালের মধ্যে ব্যাপকহারে সুপরিকল্পিত ভাবে বেআইনি বাঙ্গালী মুসলমান অনুপ্রবেশ করন।

১১। ১৯৮০ সালে স্বরাষ্টমন্ত্রীর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করণ।

১২। ২৩ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০ সালে খাগড়াছড়ি জনসভায় প্রেসিডেন্টের জনসংহতি সমিতি সদস্যদের আত্মসমর্পনের আহ্বান।

১৩। ২৫শে মার্চ, ১৯৮০ সাল কলমপতি ইউনিয়নে গণহত্যা সংঘটিত করা হয়।

১৪। ১৯৮০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে ত্রিখণ্ডিত করার ঘোষণা করন।

১৫। ৩রা অক্টোবর ১৯৮৩ সালে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক কর্তৃক সাধারন ক্ষমা ঘোষণা করণ।

১৬। ১৯৮৪ সালে ট্রাইবেল কনভেনশন (উপজাতীয় সম্মেলন) পুণর্জীবিত করা হয়।

১৭। ১৯৮২ সালে যোগাযোগ কমিটি গঠন করা হয়।

১৮। ৩১শে মে হতে ৩রা জুন, বরকল থানার তুষনছড়ায় গোড়স্থান ও ছোট হরিনা—এই তিন স্থানে গণহত্যা করা হয়।

১৯। ব্যাপকহারে ১৯৮৩ সাল থেকে বে আইনী বাঙ্গালী মুসলমান অনুপ্রবেশ করণ।

২০। বাংলাদেশকে ইসলামিক করণের নামে জুম্ম জনগণকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করণ।

সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের সমস্যা সমাধান কল্পে

সরকারী তরফ থেকে যে সব পদক্ষেপ অদ্যাবধি নেওয়া হয়েছে সেই সম্পর্কে বিশ্লেষণ করলে ইহা পরিলক্ষিত হয় যে, সরকার একদিকে সামরিক অভিযানের মাধ্যমে বল প্রয়োগ করে আর অপর দিকে কোটি কোটি টাকার টোপ ফেলে সমস্যা সমাধান করতে অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কোটি টাকার অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ঢাক ঢোল পিটিয়ে সরকার বিশ্ব বিবেককে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল সমস্যা কি ভাবে সমাধান হতে পারে তা সরকারের না বোঝার কোন কারণ নেই। তবুও সরকার জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকারের দাবীকে রাষ্ট্র বিরোধী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে অপব্যাখ্যা দিয়ে বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে চলেছে। আর রাষ্ট্র ও সরকারের বৃহত্তর স্বার্থের দোহাই দিয়ে নিরীহ শান্তিপ্রিয় জুম্ম জনগণের উপর সকল প্রকারের ফ্যাসিবাদী তৎপরতা অব্যাহত রেখে চলেছে। সরকারের এই ভণ্ড নীতি প্রয়োগ সমস্যাকে আরো জটিলতর করে মারাত্মক পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সমস্যা সমাধানের নামে প্রত্যেকটি সরকার সমূহ দ্বারা গৃহীত পদক্ষেপ ও পরিকল্পনা সমূহ পর্যালোচনা করলেই ইহা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠে যে এসব পদক্ষেপ ও পরিকল্পনা জুম্ম জনগণের সাথে ভাওতাবাজি করা ছাড়া বৈ কিছু নয়। সরকার নিজের খেয়াল খুশীমতো সমস্যা নিরূপন করে পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। যেমন—

১। Bengal Border Award Commission এর চেয়ারম্যান Sir Cyrill Redcliffe কর্তৃক জুম্ম জনগণকে মুসলমান রাষ্ট্র পাকিস্তানের জলন্ত গহ্বরে নিক্ষেপ করার পর পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের নামে চন্দ্রঘোনা কাগজের কল প্রতিষ্ঠা, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন, সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্ম ভূমির অস্তিত্ব বিলোপ্তির পথ প্রশস্ত করে দেয়।

২। গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের দোহাই দিয়ে আওয়ামীলীগ সরকার ১৯৭২ সালের সংবিধানে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জুম্মভূমির অস্তিত্ব এক কলমের খোঁচায় বিলুপ্ত করে দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে রাঙ্গামাটির বিশাল জনসভায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জুম্ম জনগণের উদ্দেশ্যে ঘোষনা করলেন—"আজ থেকে বাঙ্গালী পাহাড়ী ভাই ভাই। তোমাদেরকে উপজাতি থেকে মুক্ত করে জাতিতে উন্নীত করা হয়েছে। তোমরা এখন বাঙ্গালী (মুসলমান)।" সর্বোপরি ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নিকট আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবীতে এক ডেপুটেশন দেয়া হয়। সেখানে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলো—"লারমা তুমি কি মনে কর। তোমরা আছ ৫/৬ লাখ। বেশী বাড়া-বাড়ী করোনা। চুপচাপ বসে থাক। বেশী বাড়বাড়ি করলে তোমাদেরকে অস্ত্র দিয়ে মারবো না। প্রয়োজনে (হাতের তুড়ি মেরে) ১,২,৩,৪,৫—১০ লাখ বাঙ্গালী (মুসলমান) অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তোমাদেরকে উৎখাত করবো, দমন করবো।"

৩। ১৯৭৫ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। উদ্দেশ্য জুম্ম জনগণের সার্বিক উন্নয়ন। কিন্তু কার্যত, এই উন্নয়ন কার জন্য? নিঃসন্দেহে জুম্ম জনগণের স্বার্থের জন্য নয়। যে রাস্তাঘাট উন্নয়ন করা হচ্ছে এগুলো সৈন্য চালনার জন্যই মূলতঃ ব্যবহার করা হচ্ছে। যে দালান কোঠা তৈরী করা হচ্ছে এগুলো বি, ডি, আর আর্মি, পুলিস, আনসার ও সরকারী আমলাদের নিরাপদে অবস্থান করার জন্য; জুম্মিয়া পুনর্বাসন নাম দিয়ে মুক্ত গ্রাম ও আদর্শ গ্রাম করে জুম্ম জনগণকে কারাগারের জীবন যাপনে বাধ্য করা হচ্ছে, রবার প্লানটেশন নাম দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের বন জঙ্গল উজার করে শান্তি বাহিনীর দমন করা হচ্ছে। বস্তুতঃ জুম্ম জনগণের নাম দিয়ে বেআইনী অনুপ্রবেশকারী দের পুনর্বাসন ও উন্নয়নের পশ্চাতে এই উন্নয়ন বোর্ডের সিংহভাগ ব্যয় করা হচ্ছে।

৪। বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৬ সালে উপজাতীয় সম্মেলন (Tribal Convention) গঠন করে প্রচার করা হয় যে এই উপজাতীয় সম্মেলন পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেবে। কার্যতঃ এই উপজাতীয় সম্মেলন জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে কার্যক্রম চালিয়ে যাবার জন্য বিকল্প শক্তি হিসেবে দাঁড় করানো হয়। এই উপজাতিয় সম্মেলনে গণধিকৃত, সুবিধাবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল ও আপোষপন্থীরাই সমবেত হয়। এই উপজাতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে জুম্ম জনগণকে আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করাই ছিল সরকারের মূল উদ্দেশ্য।

৫। যখন কোটি কোটি টাকার টোপ ফেলে, উপজাতীয় সম্মেলন মাঠে নামিয়ে, সামরিক অভিযানের মাধ্যমে অকথ্য নিষ্পেষন নিপীড়ন চালিয়ে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আন্দোলন বানচাল করা সম্ভব হলো না তখন বে-আইনী অনুপ্রবেশ অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি করা হলো। এতেও যখন আন্দোলন দমন করা সম্ভব হচ্ছে না তখন বাংলাদেশ সরকার সুপরিকল্পিতভাবে ২৫শে মার্চ, ১৯৮১ সালে কলমপতি ইউনিয়নে গণহত্যা সংঘটিত করে এক বিভীষিকা ও সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে বসে।

৬। ১৯৮১ সালের ১৫ই জুন প্রেসিডেন্ট রাঙ্গামাটি সফরে আসলে জুম্ম জনগণের সমস্যা রাজনৈতিকভাবে সমাধানের দাবী করলে প্রেসিডেন্ট অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করা হবে বলে আশ্বাস দেয়। অথচ ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ সালে খাগড়াছড়ি জনসভায় প্রেসিডেন্ট ঘোষনা করে যে, জুম্ম জনগণকে কঠোরভাবে দমন করা হবে। জনসংহতি সমিতির সদস্যদেরকে ডাকাত ও দুষ্কৃতি-কারী আখ্যায়িত করে আত্মসমর্পনের হুমকি প্রদান করে। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি মূল্যায়ন ও উহার সমাধানের লক্ষ্যে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি সংসদীয় কমিটি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে

গঠন করা হয়। বস্তুতঃ এই কমিটি কোন বস্তুনিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এই কমিটি পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের পক্ষপাতী ছিল না। তাই জনসংহতি সমিতির উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও আনুষ্ঠানিকভাবে কোন বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।

৭। ৩ রা অক্টোবর, ১৯৮০ সালে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক কর্তৃক সাধারণ ক্ষমা ঘোষনা করা হয়। পাশাপাশি জনসংহতি সমিতির সাথে সযোগাযোগ করে সমস্যা সমাধানের পথ উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যে একটা যোগাযোগ কমিটিও গঠন করা হয়। কিন্তু এই কমিটি জনসংহতি সমিতির সাথে একটা রাজনৈতিক সমাধানে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনের চাইতে জনসংহতি সমিতির সদস্যদেরকে আত্মসমর্পণ করানোর প্রচেষ্টাই প্রাধান্য দিতে থাকে।

৮। ৩১শে মে থেকে ৩রা জুন পর্যন্ত বরকল থানার গণহত্যা সংঘটিত করে এবং ব্যাপকভাবে বেআইনী বাঙ্গালী মুসলমান অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে সরকার এটাই বুঝাতে চায় যে এভাবেই সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধান করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ' উল্লেখ্য যে শুধু মাত্র ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী থেকে এপ্রিল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন এলাকায় প্রায় পনর হাজার পরিবার বেআইনী ভাবে পুনর্বাসিত হয়েছে।

যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা একটি রাজনৈতিক ও জাতীয় সমস্যা সেহেতু এই সমস্যা—

(১) বে আইনী বাঙ্গালী মুসলমান অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে;
(২) সামরিক অভিযান চালিয়ে;
(৩) গণহত্যা করে;
(৪) ব্যাপক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিকল্পনা নিয়ে;
(৫) যুক্তগ্রাম ও আদর্শ গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে;
(৬) সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে;
(৭) উপজাতীয় সম্মেলন (Tribal Convention) গঠন করে;
(৮) জেল, জুলুম ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে;
(৯) রাঙ্গামাটি ও সরকারী দালান কোঠা নির্মান করে; এবং
(১০) পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার অপব্যাখ্যা ও অপপ্রচার চালিয়ে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষনের সমস্যা সমাধান হতে পারে না।

যুগে যুগে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ নির্যাতন, নিপীড়ন ও শোষনের বলি হয়ে আসছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে কত উত্থানপতন হলো অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের মৌলিক সমস্যা কি আর এই সমস্যা বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলের সমস্যার সাথে কোন পার্থক্য আছে কি নেই তা বিশ্লেষণ, মূল্যায়ণ ও নিরূপণ করার উদ্দেশ্যে অদ্যাবধি কোন সরকারই এগিয়ে আসেনি। বারে বারে শুধু সন্ধান ও মূল্যায়ণ ব্যতিরেকেই জুম্ম জনগণের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। নিঃসন্দেহে জুম্ম জনগণের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থান সব সমস্যার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলের জনগণের সমস্যার সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু এমন কতকগুলো সমস্যা আছে যা জুম্ম জনগণ ও বাংলাদেশের অপরাপর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করে। এই সমস্ত সমস্যার মধ্যে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও বিকাশের সমস্যাটাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। কেননা, ভাষা সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ভৌগলিক পরিবেশ, সামাজিক রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান, দৈহিক ও মানসিক গঠন সর্বোপরি শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ ও বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালী জনগণের মধ্যে অনেক সুস্পষ্ট বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। তেমনি বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের গাড়ো, হাজং, মনিপুরী, সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি সংখ্যালঘু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি সমূহের জনগণের সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির মধ্যে অনেক পার্থক্য সুস্পষ্ট। ফলে জাতিগত ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের মধ্যে অনেক মৌলিক পার্থক্য ও সমস্যা সৃষ্টি হতে বাধ্য, যদি না সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতির প্রতি সমমর্যাদা প্রদর্শন করে থাকে। তাই বাংলাদেশের গাড়ো, হাজং, মনিপুরী, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলোর ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের দশ ভাষাভাষী জাতি সমূহের জাতীয় অস্তিত্ব এবং জাতীয় ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস সংরক্ষণ ও বিকাশের ক্ষেত্রে বহু বিধ মৌলিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সে কারণে আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের মতো গাড়ো, হাজং, মনিপুরী, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি সমূহ অবলুপ্তির পথে।

যখনই জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও বিকাশের দাবী উত্থাপন করা হয় তখনই সে দাবীকে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও রাষ্ট্র বিরোধী বলে চিহ্নিত করা হয়। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামের মৌলিক সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে— পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার প্রদান করা। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল মহল এই আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র পুষ্ট বলে অপব্যাখ্যা দিতে চায়। বস্তুতঃ এই অপব্যাখ্যা দেওয়ার মূল উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে জুম্ম জনগণের মৌলিক অধিকার যাতে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে; যাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত হতে পারে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ কোন সময়েই স্বাধীনতা বা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন করেনি। এখনো তারা করতেছে না আর ভবিষ্যতে করার ও কোন উদ্দেশ্য নেই। জুম্ম জনগণ বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলের জনগণের সাথে সমতালে পা ফেলে দেশ মাতৃকার সেবা করতে চায়; আর সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের মহান সংগ্রামে অংশ গ্রহনে

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ প্রদত্ত "১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন" জুম্ম জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারেনি। বরঞ্চ কালক্রমে এই রেগুলেশন জুম্ম জনগণের অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়। তাই জুম্ম জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে এই রেগুলেশন যথেষ্ট নয়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ব্যতীত জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও বিকাশ সাধন করা সম্ভবপর নয়। তাই জুম্ম জনগণ বারে বারে নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত স্বায়ত্বশাসনের দাবী উত্থাপন করে আসতেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণ—

১) গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সহ পৃথক অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পেতে চায়;

২) জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও বিকাশের পূর্ণ সুযোগ থাকবে এরকম শাসন ব্যবস্থা পেতে চায়;

৩) জুম্ম জনগণের ভূমি স্বত্ব সংরক্ষিত হবে আর যাতে কেউ বেআইনী অনুপ্রবেশ বসতি স্থাপন; জমি বন্দোবস্তী ও দখল করতে না পারে সে রকম শাসনতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থার প্রবর্তন চায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা হচ্ছে একটি রাজনৈতিক সমস্যা। সুতরাং এই সমস্যাকে নিছক একটা অর্থনৈতিক বা আঞ্চলিক সমস্যা হিসাবে গণ্য করলে অবশ্যই তা বাংলাদেশের মঙ্গলজনক হতে পারেনা। বলা বাহুল্য অদ্যাবধি এই সমস্যাটা নিছক আঞ্চলিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা হিসাবে গণ্য করা হয়ে আসছে বলেই আজ জুম্ম জনগণের সাথে সরকারের এত দ্বন্দ্ব-সংঘাত। বাংলাদেশ সরকার যে পদ্ধতিতে সমস্যা নিরূপন ও মূল্যায়ন করে সমাধান করতে প্রয়াসী তা অগণতান্ত্রিক ও বাস্তব সঙ্গত নয়। তাই সমস্যা সমস্যাই থেকে যাচ্ছে অথচ মধ্যিখানে প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদীদেরই হালুয়া রুটির রাজকীয় ব্যবস্থাপনা হচ্ছে।

তাই বাংলাদেশের বৃহত্তর স্বার্থকে লক্ষ্য রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান সমস্যাবলী আশু সমাধানের পথ উন্মুক্ত করার জন্য অবিলম্বে নিম্নোক্ত বাস্তব পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়, পদক্ষেপগুলো হচ্ছে-

১) বেআইনী অনুপ্রবেশ বন্ধকরণ;

২) পার্বত্য চট্টগ্রামে বেআইনীভাবে পুণর্বাসিত বাঙ্গালী মুসলমান -দেরকে জন্যত্র সরিয়ে নেওয়া;

৩) উপজাতীয় সম্মেলনের কার্যকলাপ বন্ধ করণ;

৪) সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে সকল প্রকারের সামরিক অভিযান বন্ধ করণ;

৫) জনসংহতি সমিতির সাথে বাংলাদেশ সরকারের রাজনৈতিক পদ্ধতিতে বৈঠক অনুষ্ঠিত করণ;

৬) সাজাপ্রাপ্ত বা বিচারাধীন পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজবন্দীদেরকে মুক্তি প্রদান;

৭) কাপ্তাই বাঁধে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গের জীবিকা নির্বাহের সুষ্ঠ ব্যবস্থাদি সহ শিক্ষা ও সাংস্কৃতি, রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, কৃষি ও শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও অর্থ বরাদ্দ করণ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের দাবী হচ্ছে একটা ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত দাবী। বাংলাদেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে পরিণত করতে গেলে অবশ্যই পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার একটা সুষ্ঠ সমাধান হতে হবে। এই বাস্তব সত্যটা উপলব্ধি করেই — জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার উজ্জীবিত ও প্রতিষ্ঠা কল্পে বাংলাদেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-শিক্ষক, বুদ্ধিজীবি, আইনজীবি, সাংবাদিক তথা আপামর জনসাধারণের সমর্থন ও সহানুভূতি পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানে অন্যতম একটি অপরিহার্য শর্ত, সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এদেশের সকল দেশ প্রেমিক রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের বাস্তবমুখী রাজনৈতিক কর্মসূচী অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূর প্রসারী।

জুম্ম জাতির জাতীয় চেতনা ও জাগরণের অগ্রদূত, পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে হত্যা করার পরিপ্রেক্ষিতে জনসংহতি সমিতির বিবৃতি

প্রিয় দেশবাসী,

আপনারা নিশ্চয়ই এতদিনে বিগত ১০ই নভেম্বর, ১৯৮৩ ইংরেজী-এর মর্মান্তিক, শোকাবহ ও নির্মম হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। তবুও এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আপনারা মনে হয় জনসংহতি সমিতির বিবৃতির প্রত্যাশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও ঘটনাপ্রবাহ সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষন করার উদ্দেশ্যেই আমরা এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড সম্বলিত বিবৃতি প্রকাশে বিলম্ব করেছি।

আমরা অত্যন্ত দুঃখ ও গভীর মর্মাবেদনার সহিত এই বিবৃতি প্রকাশ করতেছি। আমার জানি এই বিবৃতি প্রকাশে আমাদের অভ্যন্তরস্থ কতিপয় স্পর্শকাতর দিক প্রকাশিত হবে; অথচ দেশবাসী তথা বিশ্ববিবেকের নিকট ১০ই নভেম্বর, ১৯৮৩ ইংরাজী এর হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত বিবরণ তুলে ধরা এবং জাতীয় বিশ্বাসঘাতক ও বিভেদপন্থীদের হীন মুখোস উন্মোচন করে দেওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাই জাতীয় জীবন ও আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আদায়ের আন্দোলনের বৃহত্তর স্বার্থকে লক্ষ্য রেখে আমরা এই বিবৃতি প্রকাশে প্রয়াসী হয়েছি।

প্রিয় দেশবাসী,

১০ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার, ১৯৮৩ ইংরেজী জুম্ম জাতির জাতীয় ইতিহাসে সবচেয়ে ঘৃনিত ও কলংকিত কালো দিবস। এই দিনে জুম্ম জাতির কুলাঙ্গার, চক্রান্তকারী, ক্ষমতালোভী ও বিভেদপন্থী গিরি, [ভবতোষ দেওয়ান] —প্রকাশ [প্রীতি কুমার চাকমা] —দেবেন [দেবজ্যোতি চাকমা] —পলাশ [ত্রিভঙ্গিল দেওয়ান] চক্র এক বিশ্বাসঘাতকতামূলক অতর্কিত সশস্ত্র আক্রমন চালিয়ে জুম্ম জাতির জাতীয় চেতনা ও জাগরনের অগ্রনায়ক মহান দেশপ্রেমিক, নিপীড়িত জাতি ও জনগণের একনিষ্ঠ বিপ্লবী বন্ধু, কঠোর সংগ্রামী, ত্যাগী, ক্ষমাশীল ও দূরদর্শী মহান জাতীয় নেতা, জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মানবেন্দ্র নারায়ন লারমাকে তাঁর ৮ [আট] জন সহকারী [পরিমল বিকাশ চাকমা, শুভেন্দু লারমা, অর্পণা চরণ চাকমা, অমর কান্তি চাকমা, মনিময় দেওয়ান কল্যানময় বীসা, সৌমিত্র চাকমা ও অর্জুন ত্রিপুরা] সহ নির্মমভাবে হত্যা করে।

ইহা সবচেয়ে মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক যে—প্রথমাবস্থায় জুম্মজাতির একতার প্রতীক মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন, কিন্তু তাঁকে অহত অবস্থায় পেয়েও জাতীয় বিশ্বাসঘাতকেরা বেকাইদা দিয়ে পর পর গুলি বিদ্ধ করে বুক ঝাঁঝরা করে দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে পালিয়ে যায়। জাতীয় বিশ্বাসঘাতকেরা শুধু এখানেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা হিংসায় উন্মত্ত হয়ে সহকর্মীদের কয়েকজনের মরদেহের উপরও ত্রাশ ফায়ার করে মরদেহ ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে তাদের ঘৃণিত চরিত্র উন্মোচন করে গেছে।

প্রিয় দেশবাসী,

আমরা যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত ও শোষিত হয়ে আসছি। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথা জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমরা অনুন্নত, পশ্চাৎপদ ও ধ্বংসপ্রায়, এই পশ্চাৎপদ ও ধ্বংসপ্রায় জুম্ম জাতির জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষনের উদ্দেশ্যে জনসংহতি সমিতির পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আপনারা সক্রিয়ভাবে সংগ্রামে সামিল হয়ে চলেছেন। আপনাদের সতর্কতা ও সংকল্প এবং ঐকান্তিক সাহায্য ও সহযোগীতায় শান্তিবাহিনী তথা জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার আদায়ের সংগ্রাম বছরকে বছর

ধরে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে; কিন্তু ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয় যে—পার্টির অভ্যন্তরে একশ্রেণীর ক্ষমতালিপ্সু, দুর্নীতিপরায়ণ স্বার্থান্বেষী ও প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃস্থানীয় কর্মী আন্দোলনের বাস্তবতার সাথে তাল মিলাতে না পেরে এবং নিজেদের দুর্বলতা, দুর্নীতি ও ক্ষমতার অব্যবহার ঢাকার উদ্দেশ্যে সর্বোপরি ক্ষমতার উচ্চাভিলাষী হয়ে পার্টির সর্বময় ক্ষমতার দখলের অভিপ্রায় নিয়ে এক উপদলীয় চক্রান্ত শুরু করতে থাকে। এই উপদলীয় চক্রান্তের হোতা হলো—প্রীতি কুমার চাকমা (প্রকাশ) ও দেবজ্যোতি চাকমা (দেবেন)। পরবর্তীতে দেশী-বিদেশী আন্তর্জাতিক গুপ্তচর ও রাজনৈতিক দালালদের খপ্পড়ে পড়ে এদের সাথে চক্রান্তে জড়িত হয়ে পড়ে—ভবতোষ দেওয়ান (গিরি) ত্রিভঙ্গিল দেওয়ান (পলাশ) সনদ কুমার চাকমা (সাগর) যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা (নির্মল)। এই উপদলীয় চক্রান্ত অনেক আগেই শুরু হয়। ১৯৭৭ সালের জাতীয় সম্মেলনে এই চক্রান্তের বহিঃপ্রকাশ সামান্যই ঘটে থাকে। এই সময় সম্মেলনের প্রতিনিধিদেরকে নিজেদের সমর্থনে আনতে অসমর্থ হওয়ায়-প্রকাশ-দেবেন চক্র আর উচ্চবাক্য না করে ব্যাপক কর্মীবাহিনীর মধ্যে ডুব দিয়ে থাকে। বলা বাহুল্য এই সময়ে বিশ্বাসঘাতক গিরি এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে কতোই না সোচ্চার ছিল। তবে তখন থেকেই গোপনে গোপনে এই চক্র পার্টির সর্বময় ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে—কেনই বা পার্টি এই ষড়যন্ত্র আগে থেকে বানচাল করে দিলো না ? এ প্রশ্নের জবাবে এটুকু বলা যথেষ্ট যে—মীরজাফরের চরিত্র বড়ই জটিল ও কুটিল। পঞ্চম বাহিনীর মুখোস উন্মোচন করে তার প্রতিবিধান করা সহজসাধ্য নয়। কেননা বাহিরের আবরণের অভ্যন্তরে এদের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকের আসল স্বরূপ লুক্কায়িত থাকে। বস্তুতঃ এই চক্রের ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র অনেক পুরাতন হলেও এদের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটিত হয় ১৯৮২ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলনে। এই সম্মেলনে গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের অগনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বল প্রয়োগের মাধ্যমে সর্বময় ক্ষমতা দখলের গোপন নীল-নকসা ফাঁস হয়ে পড়ে। সামরিক অভ্যুত্থান করে পার্টির আখন্ডিত নেতৃত্বকে হত্যা করে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব দখল করার পূর্ণ প্রস্তুতি নেয়। কুচক্রীরা তাদের হীন উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য পার্টির প্রধান প্রয়াত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এবং সন্তু লারমা সহ অন্যান্য কতিপয় নেতৃস্থানীয় কেন্দ্রীয় সদস্যদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ভাঙ্গনমূলক সমালোচনা এবং অপবাদ-অপপ্রচারে সোচ্চার হয়ে উঠে। এই সময়ে কুচক্রীরা সাত সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় কাউন্সিল নামে একটি অবৈধ কমিটিও গঠন করে; কিন্তু বিভেদপন্থীদের এই সব হীন ষড়যন্ত্র সংগ্রামী ও একনিষ্ঠ প্রতিনিধি দলের বিপ্লবী চেতনা ও উপলব্ধির নিকট ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। শেষ পর্যন্ত কুচক্রীরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে নিতে বাধ্য হয় আর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের নির্বাচনে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জনে চরমভাবে ব্যর্থ হয়।

প্রিয় দেশবাসী,

এই ষড়যন্ত্রকারী-বিভেদপন্থীরা বাহ্যতঃ ১৯৮২ সালের জাতীয় সম্মেলনের রায় মেনে নিলেও তাদের উপদলীয় চক্রান্ত থেকে বিরত থাকেনি। বরঞ্চ জাতীয় সম্মেলনে তাদের হীন ষড়যন্ত্র বানচাল হওয়ার পর পরই আবার শুরু করলো নুতন ষড়যন্ত্র। পার্টির নেতা ও নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য স্বীকার না করে এবং দলীয় শৃঙ্খলা চরমভাবে লঙ্ঘন করে কুচক্রীরা প্রকাশ্যে কর্মীবাহিনী ও জনগণের মধ্যে পার্টির নেতৃত্ব ও নেতৃস্থানীয় সদস্যদের সম্পর্কে শুরু তরল মিথ্যা অপপ্রচার ও অপবাদ রটানো; আর গোপনে গোপনে সামরিক অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি গ্রহন করতে লাগলো। কেন্দ্রের নির্দেশাবলী অমান্য করতে লাগল; দুর্নীতি ও ছল চাতুরীর মাধ্যমে জনগণ থেকে টাকা সংগ্রহ করে আত্মসাৎ করতে লাগলো। দ্রুত নিষ্পত্তির সস্তা শ্লোগান দিয়ে তথাকথিত বিদেশী সাহায্যের দোহাই দিয়ে ও বিভিন্ন প্রকারের মিথ্যা আশ্বাস ও ভাওতা দিয়ে কর্মীবাহিনীর এক অংশ ও ব্যাপক জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি এনে দেওয়ার অব্যাহত ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে যেতে থাকে। **ষড়যন্ত্র এখানেই শেষ নয়, তথাকথিত "সুরতন রাজ্য" প্রতিষ্ঠার দিবাস্বপ্ন বাস্তবায়ন করার নামে তাদের হীন ও সংকীর্ণ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার মানসে দেশী বিদেশী গুপ্তচর ও রাজনৈতিক দালালদের খপ্পড়ে পড়ে জুম্ম জনগণের আত্ম-নিয়ন্ত্রনাধিকার আদায়ের সংগ্রাম বানচাল করে দিতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠে।** পরিস্থিতি দিনদিন জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ১০ই জুন, ১৯৮৩ ইংরেজী, বিশেষ সেক্টর কার্যালয়ে (তথাকথিত বিভেদপন্থীদের সদর দপ্তর) সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পার্টির অধিষ্ঠিত নেতৃত্বকে উৎখাত করার নীল নকশা প্রণয়ন করে শপথ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মসূচী ঘোষণা করে।

প্রিয় দেশবাসী,

এতদ্‌সত্ত্বেও বিভেদপন্থীদের আত্ম সমীক্ষার সুযোগ প্রদানে প্রচুর সময় দিয়ে এবং উদ্ভূত সমস্যা শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিরসনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্র অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। উচ্চ পর্যায়ে বৈঠকের জন্য বারবার কুচক্রীদেরকে আহ্বান করা হয়। বলা বাহুল্য—প্রয়াত পার্টির সভাপতিও ব্যক্তিগতভাবে উদ্ভূত সমস্যা শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিরসনে বার-বার কুচক্রীদের আহ্বান দিয়েছেন; কিন্তু চক্রান্তকারীদের অনমনীয় অগনতান্ত্রিক ও ষড়যন্ত্রমূলক মনোভাবের কারণে সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত দক্ষিণাঞ্চলের একটা ইউনিটের সাথে আত্মগোপনে অবস্থানরত বিশেষ সেক্টরের সদস্যদের উস্কানীমূলক ও উত্তেজনাপূর্ণ কথাবার্তা থেকে ১৪ই জুন, ১৯৮৩ ইংরেজী এক সশস্ত্র সংঘর্ষ বাঁধে। এই সংঘর্ষে চক্রান্তকারীরা ষড়যন্ত্রের নীল নকসা সহ সকল গোপনীয়

দলিল-পত্রাদি ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়।

ইহার পরেও ষড়যন্ত্রকারীরা স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা না করে পুনরায় আত্মঘাতী ও নাশকতামূলক তৎপরতা শুরু করতে থাকে। তবুও কেন্দ্র দীর্ঘ সময় ধরে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিরসনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। কিন্তু চক্রান্তকারীদের অনমনীয়, অগনতান্ত্রিক ও ষড়যন্ত্রমূলক মনোভাবের কারণে পূর্বের ন্যায় দ্বি-পাক্ষিক পর্যায়ের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। ফলে দেশ, জাতি ও আন্দোলনের স্বার্থে বিভেদপন্থীদেরকে উৎখাত করা ও তাদের ষড়যন্ত্র বানচাল করে দেয়ার উদ্দেশ্যে পার্টি চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে সামরিক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

অবশেষে বিভেদপন্থী চতুঃচক্রীরা যখন কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমনে ও কূটনৈতিক চাপে কোনঠাসা হয়ে পড়লো, তখন জাতীয় বেঈমানেরা উদ্ভূত সমস্যা শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিরসন করার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসতে বাধ্য হলো। আন্দোলন তথা দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে পার্টির আভ্যন্তরীন মতবিরোধই শান্তিপূর্ণভাবে নিরসনের জন্য পার্টি ও বিভেদপন্থীদের মধ্যে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বৈঠকে "ক্ষমা করা ও ভুলে যাওয়া"—এই নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্বক স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া অনতিবিলম্বে পরস্পরে আক্রমন ও পাল্টা আক্রমন বন্ধ করা, আটকাধীন সদস্যদেরকে সসম্মানে মুক্তি প্রদান, বিভেদপন্থীদের থেকে দখলকৃত অবৈধ ও গোপনীয় দলিল-পত্র ও নীল নকসা নষ্ট করা সহ পূর্ণমিলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বস্তুতঃ উক্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছুদূর অগ্রগতিও সাধিত হয়। অস্ত্র সংবরন ও বন্দী সদস্যদের মুক্তিও দেওয়া হয়—আর পুর্ণমিলনের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে যোগাযোগও হতে থাকে। সারা দেশেও কর্মী বাহিনীতে একটা শান্তি ও স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পার্টির সর্বস্তরে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধানের একটা মানসিক অবস্থা ও পরিবেশ বিরাজ করতে থাকে। কিন্তু গোপনে গোপনে শান্তি চুক্তির অন্তরালে গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র আবার দেশী-বিদেশী আন্তর্জাতিক গুপ্তচর ও রাজনৈতিক দালালদের চক্রান্তের শিকারে পরিণত হয়ে নিজেদের হীন ও সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে আরেক জঘন্যতম ষড়যন্ত্র করে বসে। উক্ত পর্যায়ের বৈঠকে গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে ১০ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার ১৯৮৩ ইংরেজী জাতীয় বিশ্বাসঘাতক, প্রতিক্রিয়াশীল, বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র এক চরম বিশ্বাসঘাতকতামূলক অতর্কিত সশস্ত্র হামলা পরিচালনা করে জাতীয় ইতিহাসে এক কলঙ্কিত অধ্যায় রচনা করলো। জুম্ম জাতির জাতীয় ইতিহাসে এই ১০ই নভেম্বর ১৯৮৩ ইংরেজী সবচেয়ে ঘৃণিত ও কলঙ্কিত দিবস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইলো।

প্রিয় দেশবাসী,

১০ই নভেম্বর ১৯৮৩ ইংরেজী হত্যাকাণ্ডে জাতীয় বিশ্বাসঘাতক, খুনী ও বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র ও সেই সাথে দেশী-বিদেশী রাজনৈতিক গুপ্তচর ও দালালেরা আনন্দিত ও উল্লসিত হয়েছে; বাংলাদেশ সরকার ও তার দালালেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে; বিশ্ববিবেক হয়েছে কলুষিত ও শঙ্কিত; বিশ্বমানবতাবাদ হয়েছে স্তম্ভিত ও বিস্মিত; দেশ-বিদেশের মিত্র ও শুভাকাংখীরা হয়েছেন দুঃখিত ব্যথিত ও হতবাক; প্রিয়জন ও আত্মীয়-স্বজনেরা হয়েছেন মর্মাহত, শোকাতুর ও মুহ্যমান; জুম্ম জনগণ হয়েছেন শোকার্ত ও বিস্মিত, পার্টির সমগ্র কর্মীবাহিনী হয়েছেন একদিকে গভীরভাবে শোকাভিভূত ও মর্মাহত এবং অপরদিকে জাতীয় বেঈমানদের প্রতি বিক্ষুব্ধ ও ক্ষমাহীন। জাতীয় জীবনে বিষাদের কালোছায়া নেমে আসে আর আন্দোলন তথা দেশ ও জাতির হয়েছে অপূরণীয় ক্ষতি।

যিনি জুম্ম জাতির মনে সৃষ্টি করেছিলেন মুক্তির প্রবল আকাঙ্খা দেশমাতৃকার প্রতি গভীর মমত্ববোধ আর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার অপ্রতিরোধ্য কামনা; যিনি জন্মভূমি ও জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জুম্ম জনগণেরই মহান পার্টি জনসংহতি সমিতি—যার পতাকাতলে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাংখো, খুমী, লুসাই, মরুং, বোম, মারমা / [illegible], চাক, ত্রিপুরা, চাকমা—এই দশ ভাষাভাষী নিপীড়িত ও নির্যাতিত জাতি ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছে এবং যার দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের দ্বারা নিশ্চিত ধ্বংসের মুখোমুখী হয়েও জুম্ম জাতি আজও টিকে রয়েছে, সেই মহৎ ও মহান রাজনীতিবিদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ১০ই নভেম্বর, ১৯৮৩ ইংরেজী ষড়যন্ত্রমূলক হত্যাকাণ্ডে শহীদ হওয়ায় পার্টি হারিয়েছে তার মহান কর্ণধারকে, জুম্ম জাতি হারিয়েছে মহান অগ্রনায়ক ও নেতাকে, আর বিশ্বের নিপীড়িত-নির্যাতিত জাতি ও জনগণ হারিয়েছে তাদের এক মহান বিপ্লবী বন্ধুকে। তাঁর অমর অবদান পার্টি; পার্টির শান্তিবাহিনী, জুম্ম জাতি ও জনগণ তথা বিশ্বের মুক্তিকামী জাতি ও জনগণের নিকট অনুপ্রেরণার উৎস ও আলোর দিশারী রূপে যুগ যুগ ধরে চির দেদীপ্যমান হয়ে থাকবে।

হে প্রিয় দেশবাসী,

আপনাদের কাছে একটি আবেদন—আমরা মনে করি আমরা আপনাদের নিকট ১০ই নভেম্বর ১৯৮৩ ইংরেজী তারিখে সংঘটিত — সেই গভীর মর্মান্তিক ও শোকাবহ হত্যাকাণ্ডের আড়ালে কি ষড়যন্ত্র নিহিত আছে—তার পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি। আপনারা এই প্রকারের হীন ও জঘন্যতম ঘটনার মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করুন। বিচার করুন—

কারা দেশপ্রেমের আলখেল্লা পরে জাতীয় সর্বনাশ সাধনে উন্মত্ত হয়েছে?

শত্রুকে চরম আঘাত দেওয়ার পূর্ব মুহূর্তে কারা দেশী-বিদেশী

আন্তর্জাতিক গুপ্তচর ও রাজনৈতিক দালালের গপ্পরে পড়ে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন বানচাল করে দিয়ে চলেছে ?

কারা নিজেদের দুর্নীতি, অপকর্ম, ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্বলতা ঢাকার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়ে পার্টির সর্বময় ক্ষমতা দখলের ব্যর্থ অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে ?

কারা তথাকথিত বৈদেশিক সাহায্যের দোহাই দিয়ে দ্রুত নিষ্পত্তির সস্তা শ্লোগানে জুম্ম জনগণ ও বিপ্লবী কর্মীবাহিনীকে বিভ্রান্ত ও ভুল পথে পরিচালিত করে আন্দোলনের গতিপথ রুদ্ধ করতে চাইছে ?

কারা জাতীয় চরিত্রকে হনন করে নিজেদের হীন ও সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করার হীন অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ?

কারা উদ্যোগহীন, পরনির্ভরশীল, নিষ্ক্রিয় ও প্রতিক্রিয়াশীল ?

কারা বিভীষণ—মীরজাফরের বৃত্তি অবলম্বন করে জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনে পঞ্চম বাহিনীর ভূমিকা পালন করে চলেছে ?

কারা সত্যিকারভাবে জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণ করতে চায় ?

হে প্রিয় দেশবাসী,

এসবকিছু আপনাদের অবিদিত নয়। তবুও বলা বাহুল্য যে—এই চক্রান্তকারী বিভেদপন্থী জাতীয় বিশ্বাসঘাতক খুনী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র জন্মভূমি ও জাতীয় অস্তিত্ব তথা জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার চায় না, এরাই দেশীবিদেশী আন্তর্জাতিক গুপ্তচর ও রাজনৈতিক দালালদের গপ্পরে পড়ে দ্রুত নিষ্পত্তির মতো সস্তা শ্লোগান দিয়ে তথাকথিত বৈদেশিক সাহায্যের প্রলোভন দেখিয়ে নিজেদের অপকর্ম দুর্নীতি দুর্বলতা ও ক্ষমতার অপব্যবহার ধামাচাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আজ বিভীষণ মীরজাফরের বৃত্তি গ্রহন করেছে। এরাই সুদীর্ঘ বার বছর ধরে অর্পিত দায়িত্ব পালন না করে অপচ ক্ষমতা কুক্ষিগত করে আন্দোলন গতিপথ বন্ধ করে রেখেছিল এবং ক্ষমতা অপব্যবহার করে আন্দোলনের ক্ষতিসাধন করেছে। এরাই নিজেদেরকে সাচ্চা বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিক হিসেবে জাহির করে অগণতান্ত্রিক উপায়ে গুপ্তহত্যার আশ্রয় নিয়ে ও উপদলীয় চক্রান্ত করে পার্টির সর্বময় ক্ষমতা দখলের দিবাস্বপ্ন দেখে এবং পার্টির অন্তর্ঘাতীমূলক কাজে সক্রিয়। এরাই জনগণের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে ; এরাই জাতীয় চরিত্রকে হনন করে দেশীবিদেশী আন্তর্জাতিক গুপ্তচর ও রাজনৈতিক দালালদের চক্রান্তে জড়িত হয়ে নিজেদের হীন ও সংকীর্ণ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য অদ্বিতীয় জাতীয় নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে হত্যা করেছে।

এই গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র আপনাদের নিকট অনেক গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তারা বলেছিল—দ্রুত নিষ্পত্তির কথা ; তথাকথিত বৈদেশিক সাহায্যের কথা ; আর রাতারাতি জুম্ম জাতিকে মুক্ত করে দেওয়ার অঙ্গীকার তারা করেছিল। আপনারা ভেবে দেখুন, মূল্যায়ন করুন—তাদের প্রতিশ্রুতির কথা। রাতারাতি দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার দিবাস্বপ্ন দেখে দ্রুত নিষ্পত্তির নামে আজ জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনে কি নিদারুণ আঘাত তারা হানলো আর জাতীয় বিশ্বাসঘাতক এই চতুঃচক্রী গৃহযুদ্ধ শুরু করে দিয়ে ও এক সপ্তাহের রাজত্ব কায়েম করে জুম্ম জনগণকে কি এক অনিশ্চয়তার গহ্বরে নিক্ষেপ করলো। তথাপি এই বিভেদপন্থীরা এখনো পর্যন্ত গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ব্যাপক জনগণকে বিভ্রান্ত করে ধোঁকা দেওয়ার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিভেদপন্থী, চক্রান্তকারী ও খুনীদের এইসব হীন ও জঘন্য কার্যকলাপ আপনারা গভীরভাবে বিচার বিশ্লেষণ করুন—এই আমাদের একান্ত আবেদন।

হে প্রিয় দেশবাসী,

আজ সমগ্র পার্টি তথা জুম্ম জনতা এক চরম সংকটের মুখোমুখী। একদিকে গৃহযুদ্ধ অপরদিকে বাংলাদেশ সরকারের দুরভিসন্ধিমূলক সামরিক ও বেসামরিক কার্যক্রম। সেইসাথে দেশীবিদেশী রাজনৈতিক গুপ্তচর ও দালালদের গতিবিধি ও কর্মতৎপরতা। সর্বোপরি সমগ্র দেশে এক কৃত্রিম অর্থনৈতিক সংকট বিরাজমান। এমতাবস্থায় একমাত্র পার্টি ও জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তিই এই চরম সংকট মোকাবিলা করতে সক্ষম। সুতরাং পার্টির কর্ণধার প্রিয় নেতাকে হারানোর শোকে আর শোকাতুর অবস্থায় হতাশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে দোলায়িত না হয়ে আসুন, আমরা আবারো সম্মিলিতভাবে আমাদের আত্মমুখী প্রস্তুতি জোরদার করি এবং কঠোর বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করে পার্টি ও জনগণ আরো ঐক্যবদ্ধ হই ; সম্মিলিতভাবে বিশ্বাসঘাতক, প্রবঞ্চক, মীরজাফরের গোষ্ঠী—গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিয়ে অচিরেই গৃহযুদ্ধের অবসান করে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রাম জোরদার করি। আসুন, প্রয়াত নেতার নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করে তাঁরই প্রদত্ত আন্দোলনের কার্যক্রম তথা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে আরো উদ্যোগী ও সংগ্রামী হই।

আমরা, শান্তিবাহিনী তথা পার্টির সকল সদস্য ধৈর্য, সাহস, কষ্ট, সহিষ্ণুতা, মনোবল, সংযম ও দৃঢ়তা নিয়ে নেতা ও নেতৃত্বের উপর গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা রেখে গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রকে উৎখাত করে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র— নিপাত যাক।

পার্টি ও জুম্ম জনগণের মধ্যকার ঐক্য ও সংহতি— দীর্ঘজীবি হউক।

ইতি

বিনীত—

তারিখ—৩১/১২/১৯৮৩ ইংরেজী।

কেন্দ্রীয় কমিটি,
জনসংহতি সমিতি,
পার্বত্য চট্টগ্রাম।

শান্তি বাহিনী